উপন্যাস সিরিজের অষ্টম সংখ্যা।

গুল-কাশেম।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১লা বৈশাখ, ১৩২৭।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

উপহার
তারিখ ।
শ্রী
সত্যম
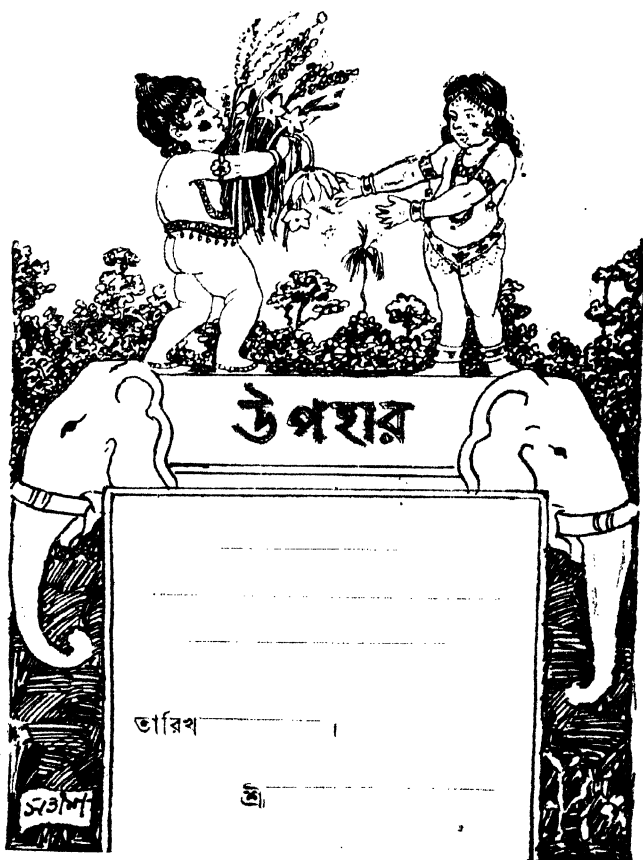
গুল্-কাশেম।

(১)

এক পরমাসুন্দরী, তড়িৎকান্তিময়ী যুবতী, দ্বিতলের এক নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া গান গাহিতেছিল। সে কক্ষে আর কেহই ছিল না।

রজনীর প্রথম প্রহর অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়াছে। কক্ষ দীপোজ্জ্বলিত। সেই দীপের আভা, যুবতীর নীলবর্ণের সাঁচ্চাখচিত ওড়নার উপর পড়িয়া চিক্‌মিক্ করিতেছিল।

সেই যুবতী পরমাসুন্দরী। হাজারের মধ্যে অমন একটা সুন্দরী মেলে কিনা সন্দেহ! তাহার কক্ষসজ্জাও সুরুচিপূর্ণ। তাহার পোযাক পরিচ্ছদও রত্নখচিত এবং সমুজ্জ্বল।

বাহিরের স্নিগ্ধ নৈশসমীর, তাহার আরক্ত গণ্ডদেশ স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে এবং তাহার চূর্ণ অলকগুলিকে মৃদুভাবে দোলাইয়া রঙ্গ করিতেছে আর সঙ্গীত-জনিত শ্রমের চিহ্ন স্বরূপ, তাহার উজ্জ্বল ললাটের স্বেদবিন্দুকে শুখাইয়া দিতেছে।

সারেঙ্গ বাজাইয়া সেই রমণী গাহিতেছিল—

"দিল্‌কে জখ্‌মে তুম্ কর্ ন সকে মরহম্
খ্‌কে কতারে বৈসাহী রহী
খেয়ালে আজাদীকো আযাথা তেরা পাশ
তুম্‌ভি দেখতে রহো ক্যা তেরে কুছ বশ নহি।"

তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের সহিত, সারেঙ্গ যেন নিজের সুর মিলাইয়া বাজিতে গিয়া, এক এক সময়ে বেসুরা হইয়া পড়িতেছিল। সেটা সারেঙ্গের দোষই হউক বা সেই তন্বঙ্গী বাদিকার অসহিষ্ণুতার ফলই হউক। তাহাতে সেই সুন্দরী বিরক্ত হইয়া এক এক সময়ে বলিতেছিল—"দুর-ছাই! সারেঙ্গটা আজ বড়ই অবাধ্য হইয়াছে।"

প্রিয়জন সমাগমের আশায় সেই রমণী উৎফুল্ল চিত্তা। কিন্তু প্রিয়তমের অনাগমন জনিত বিলম্বে, তাহার মনটা এক এক সময়ে বড়ই অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছিল। আর এই চিত্তচাঞ্চল্যের জন্য, পঞ্চমের সুরভরা সারেঙ্গ মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহী হইয়া পড়িতেছিল।

গানটীর পুনরাবৃত্তি করিয়া সে যেমন সেই সারেঙ্গটী তাহার পাশে রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে কে একজন বাহির হইতে বলিল—"বাহবা মেরে গুল্!"

সেই সুন্দরীর নাম গুল্‌নেয়ার। সে তখনই দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই সানন্দে বলিয়া উঠিল—"বহুৎ সাবাস মেরে পেয়ারে জান্!"

যে বাহিরে দাঁড়াইয়া এই কথা বলিয়াছিল, তাহার নাম কাশেম। কাশেম এই পরমাসুন্দরী গুল্‌নেয়ারের স্বামী।

কাশেম কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই, গুল্ সারেঙ্গটা যথাস্থানে তুলিয়া রাখিয়া স্বামীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া কৃত্রিম বিরক্তির সহিত তাহার রাঙ্গা ঠোঁট দুটী ফুলাইয়া বলিল—"বেশ ত তুমি যাই হোক্! আমি ভাবিয়া মরিতেছি—আমার গান বেসুরা হইতেছে—আর এত রাত পর্য্যন্ত তুমি আমোদে মাতিয়া বাহিরে ঘুরিতেছ।"

কাশেম পত্নীকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া

বলিল—"সবে এই এত বড় রাতটার একটা প্রহরমাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। এরই মধ্যে তুমি এত অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছ ?"

গুল্ বলিল—"তুমি যদি দরদী হইতে, তাহা হইলে আমার মনের ব্যথা বুঝিতে !"

কাশেম সহাস্য মুখে বলিল—"তাহ'লে আমার চেয়ে তোমার আর কেউ বেশী দরদী আছে নাকি, যে তোমার প্রাণের ব্যথাটা আমার চেয়েও অতি সহজে বুঝিতে পারে ?"

গুল্ একটু গম্ভীর মুখে বলিল "হাঁ—তা আছে বই কি ?"

কাশেম। শুনি সে ভাগ্যবানটী কে ?

গুল। আমার য-ম।

কাশেম। ছিঃ ও কথা কি বলিতে আছে ! এখন কাজের কথা বলি শোন। ভারি জরুরী।

গুল। হাঁ—যে জন্য গিয়াছিলে তা সফল হইল কি ?

কাশেম। না—সুলতান কিছুতেই রাজি হন না। তিনি বলেন—"যে হুকুম একবার আমার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে তাহার প্রত্যাহার করিলে বড়ই হাল্কা হইয়া পড়িব।"

গুল্। তাহা হইলে তোমাকেই দামাস্কাসে যাইতে হইবে !

কাশেম। হাঁ ! অনেক বহুমূল্য জহরৎ আর সওগাত যাইতেছে। সুলতান আর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে চাহেন না। আমি তাঁর খাস মকীম। জহরতের ব্যাপার আমি যত বুঝি, এমন ত আর কেউ নয়।

গুল্ স্থিরভাবে সকল কথা শুনিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। তারপর কাশেমের গলা জড়াইয়া আবদারের ভাবে বলিল—"আমি তাহলে

তোমার সঙ্গে যাবো। আমাকে সঙ্গে না নিলে আমি তোমাকে যেতে দেবো না।"

কাশেম স্নেহভরে গুলালের চিবুক ধরিয়া বলিল—"তাও কি হয় গুল্! তাও কি সম্ভব গুল! আমাদের এই সব বহুমূল্য সওগাদের রক্ষীরূপে একশত ফৌজ সঙ্গে যাচ্ছে। তোমাকে সঙ্গে নেবার কোন সুবিধাই নেই। আর আমার ইচ্ছা থাক্‌লেও সুলতান তোমায় যেতে দেবেন কেন? আমাদের বসোরার সুলতান—একটা ঘরোয়া বিবাদের আপোষনিষ্পত্তির জন্য নজরানা-রূপে দামাস্কাসের সুলতানকে এই সব বহুমূল্য সওগাদ পাঠাচ্ছেন। আমার সঙ্গে রাজ্যের দুজন বড় বড় উজীর যাবেন। এরূপ স্থলে তোমায় নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব?"

বুদ্ধিমতী গুল্ সব কথাই বুঝিল। তবুও সে বলিল—"নিয়ে যাবার কোন উপায়ই কি নেই?"

কাশেম। না—

গুল্। তোমার ফিরতে কত দেরী হবে?

কাশেম। পথটা ত সহজ নয়। দু দুটো মরুভূমি পেরুতে হবে। পথে ডাকাতের ভয়ও আছে। তাদের উৎপাৎ থেকে এড়াবার জন্য আমাদের হয়ত সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে ঘুরে যেতে হবে। তাহলে বুঝে দেখ—তোমার যাওয়া নিরাপদ কি না?

গুল্। তাত বুঝলুম কিন্তু তোমার ফিরতে কত দেরী হবে তাই বল।

কাশেম। বোধ হয় দুই মাস!

গুল্। দু-মা-স! আমায় তা হলে দেখবে কে? আমি যে এ সংসারে একা।

কাশেম। কেন বুড়ো দাই রইলো। সে যে আমায় ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছে। তাকে আমি মার মত ভাবি। তা ছাড়া আমার খুল্লতাত পুত্র ইয়াশিন আলি রইলো! তার কাছে ত তোমার কোন লজ্জা সঙ্কোচ নেই। দুটো মাস বইতো নয়। কাজটা একটু চালাকির সহিত করে আসতে পারলে অর্থাৎ তাঁদের বিবাদটা মিটিয়ে দিতে পারলে, সুলতান বলেছেন, আমায় তাঁর খাজনাখানার উজীর করে দেবেন। ভবিষ্যৎ ভাগ্য আমার অতি সমুজ্জ্বল। সে ভাগ্য কি উপেক্ষা কর্ত্তে আছে? আমাদের বসোরা রাজ্যে এ পদের সম্মান কত তাত জান!

গুল্ তাহার স্বামীর কথা শুনিয়া বুঝিল—স্বামিসঙ্গিনী হওয়া এস্থলে খুবই অসম্ভব। তাহার প্রাণে একটা নিরাশা দেখা দিল। আর এইরূপ নিরাশাজনিত চিন্তায় তার প্রাণের ভিতরটা বড়ই অশান্তি পূর্ণ হইয়া উঠিল। ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের একটা অন্ধকারময় ছায়া, তাহার প্রেমসমুজ্জ্বল হৃদয়কন্দরকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া দিল। একটু আগে যে মুখ, হাসি মাখানো ছিল, এখন যেন কে তাহাতে কালি ঢালিয়া দিল।

কাশেম তাঁহার প্রাণাধিকা পত্নীর মনের ব্যথা বুঝিলেন। যে গুল্‌কে তিনি একদণ্ড চোখের আড়াল করিয়া থাকিতে পারেন না, তাহাকে দীর্ঘ দুই মাসের জন্য ছাড়িয়া বিপদ সঙ্কুল বিদেশে যাইতে হইবে। কিন্তু তাঁহার আর ফিরিবার উপায় নাই। সুলতানের বেতনভোগী কর্ম্মচারী তিনি। এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিলে তাঁহার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে। কেন না—বসোরা রাজ্যে আইন বলিয়া কোন কিছু নাই। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী সুলতানের মুখের কথাই হইতেছে এ সব দেশের আইন।

পতি পত্নী উভয়েরই চিন্তাস্রোত একই পথগামী। দুই জনেই ভাবী বিরহাশঙ্কায় কাতর। দুইজনের মনেই নানারূপ দুশ্চিন্তা জাগিয়া উঠিতেছে।

কাশেম বহুক্ষণ চিন্তার পর, অনেকটা প্রশান্ত ভাব ধারণ করিলেন। তিনি যখন বুঝিয়া দেখিলেন, তাঁহার সোদর তুল্য ইয়াশিন—যে এই গুল্‌-নেয়ারকে সহোদরা ভগ্নির মত দেখে, তাহার কাছে গুল্‌কে রাখিয়া যাইতে কোন আশঙ্কা নাই। আর এই বৃদ্ধা দাইও তাঁহাকে ছেলেবেলা হইতে মানুষ করিয়াছে। গুল্‌কে সে ঠিক তার কন্যার মত দেখে। তাহার কাছে গুল্‌কে রাখিয়া গেলে তাহার কোন কষ্টই হইবে না।

মানুষ যখন অকুল পাথারে পড়ে, তখন সে তৃণ খণ্ডকেও আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয়। কাশেমও সেইরূপ সকল দিক দিয়া ভাবিয়া বুঝিল, এই দুই মাসের জন্য ইয়াশিনের তত্ত্বাবধারণে গুলালকে রাখিয়া গেলে কোন অসুবিধাই ঘটিতে পারে না।

সে তাহার মনের কথা তাহার পত্নীকে বুঝাইয়া বলিল। অন্য উপায় যখন আর নাই, তখন গুল্‌ অগত্যা স্বামীর এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল।

মধ্যে আর একটী দিন মাত্র ব্যবধান। পরশ্ব দিনের প্রভাতেই কাশেমকে দামাস্কস্‌ যাত্রা করিতে হইবে।

সর্ব্বসুখদায়িনী, চিন্তানাশিনী, নিদ্রাদেবী—এই বিরহাশঙ্কা-কাতর পতি-পত্নীর চোখে, মোহের অঞ্জন পরাইয়া দিলেন। উভয়েই তখন সকল চিন্তা ভুলিয়া সুষুপ্তির কোমল ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতে লাগিল।

শেষ রাত্রে কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া গুল্‌ চীৎকার করিয়া উঠিল—"কাশেম! কাশেম!"

কাশেমের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া গুল্‌কে জাগাইয়া দিয়া বলিল—"এই যে গুল্! আমি এখানে!"

(২)

দুঃখের দিন যখন মানুষের অদৃষ্টে চাপিয়া বসে, তখন সুখের দিন পলাইতে পারিলেই যেন বাঁচে। আর সে যখন চলিয়া যায়, কেবলমাত্র রাখিয়া যায়—স্মৃতি।

পরের দিনটী কাটিল। সেদিন কাশেম আর বাটীর বাহির হইলেন না। বিষয় আশয়, কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি সোদরপ্রতিম বন্ধু ইয়াশিনকে যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়া তাহার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। গুলের হাতেও প্রচুর অর্থ রহিল।

তারপর তিনি বৃদ্ধা দাইমাকে ডাকিলেন। এই বৃদ্ধা দাইয়ের নাম আশীরা। কাশেমের পিতার আমল হইতে সে এই বাটীতে চাকরী করিতেছে। তাহার একটীমাত্র সন্তান হইয়াছিল। সেটি এই কাশেমের বাল্য সঙ্গী ছিল। তাহার অকাল মৃত্যুর পর বৃদ্ধা আশীরার ষোল আনা স্নেহ, এই কাশেমের উপর পড়িয়াছিল। আর কাশেমের বউ গুলালের উপর তাহার মায়ের অধিক স্নেহ। গুলাল সময়ে স্নান করিল কি না, সময়ে আহার করিল কি না, উপযুক্ত ভাবে সান্ধ্য প্রসাধন করিল কি না, সকল বিষয়েই সে গুলালের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিত। আর বলা বাহুল্য, গুলালও তাহাকে মায়ের মত শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। গুলাল গৃহকর্ত্রী হইয়াও, আশীরার হাতে সব ছাড়িয়া দিয়াছিল। আশীরা ধরিতে গেলে কাশেমের এই সংসারের গৃহিণী।

এই আশীরার কাছে গুলনেয়ার কোন বিষয় গোপন করিত না।

মায়ের কাছে কন্যা যেমন নিঃসঙ্কোচে মনের সকল কথা ব্যক্ত করে, আশীরার কাছে গুলনেয়ারও সেই ভাবে তাহার সুখ দুঃখের কথা বলিত।

দাইকে ডাকিবামাত্র সে তখনই কাশেমের সম্মুখে আসিয়া বলিল—“আমায় ডেকেছ বাবা কাশেম?”

কাশেম স্নেহ-কোমল স্বরে বলিল—“এখানে একটু বসো দাই মা! তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।”

আশীরা, কাশেমের কাছে বসিল। কি যে এমন জরুরি কথা, তাহা সে ঠিক বুঝিতে না পারিয়া যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল।

কাশেম বলিল—“দাই মা! তুমি শুনেছো?”

আশীরা। কি কথা বাবা?

কাশেম। কাল সকালে আমি সুলতানের একটা খুব জরুরি কাজে, দামাস্কস্ সহরে যাচ্ছি।

আশীরা। হাঁ—গুল্ আমায় তা বলেছে। শুনে অবধি বাবা, আমি জ্যান্তে মরা হয়ে আছি।

কাশেম। তা হ'লে চল্‌বে না। সাহস হারালে চল্‌বে না দাই মা! আমি তোমার কাছেই আমার গুল্‌কে রেখে যাচ্ছি। তোমার ভরসা খুবই আমি করি। ইয়াশিন গুল্‌কে তাঁর বড় বোনের মত ভাল বাসে, ভক্তি করে। ইয়াশিন আমার বিষয় কর্ম্ম দেখ্‌বে শুনবে। তোমাদের যা কিছু সংসারের জন্য প্রয়োজন হয়, সবই সে করে দেবে। সে আমার সহোদরের চেয়েও বেশী। দুটো মাস বইতো নয়। তোমরা একটু সাবধানে থাক্‌বে। অমি ইয়াশিনকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি। তার হাতেই তোমাদের সঁপে দিয়ে যাচ্ছি।”

ঠিক এই সময়ে ইয়াশিন সেখানে আসিয়া বলিল—"দাদা—আমায় ডেকেছেন ?"

কাশেম। হাঁ—ভাই! তোমার সঙ্গে আজ আমার একটা খুব কাজের কথা আছে।

ইয়াশিন। হুকুম করুন। চিরদিনই আমি আপনার অনুগত। আমার যা কিছু ভাগ্য পরিবর্ত্তন, সবই আপনার চেষ্টাতেই হয়েছে।

কাশেম। নসীব খোদার দেওয়া। মানুষ কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। ও সব কথা ছেড়ে দাও। তুমি আমার নিকট আত্মীয়, খুল্লতাত পুত্র। আমার চেয়ে এক বৎসরের ছোট তুমি। এক সঙ্গে খেলা ধুলা, মোক্তবে লেখাপড়া, একই রাজদরবারে চাকরি করে—আমরা দুজনে পাশাপাশি থেকে এখন সংসারী হয়ে উঠেছি। আজ তোমাকে একটা কঠোর কর্ত্তব্য ভার দিয়ে যাব। সেটা তোমায় পালন কর্ত্তে হবে।

ইয়াশিন নম্র মুখে বলিল—"অমন সংকোচ করে আদেশ কচ্ছেন কেন দাদা ? আপনার অনুগত আমি, আশ্রিত আমি, অনুজ আমি। গোলাম আমি। যা হুকুম করবেন তা জীবন পণ করে পালন করবো।

কাশেম বলিলেন—"আমার বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে যা করা কর্ত্তব্য—তা আমি তোমায় কাল সব বুঝিয়ে দিয়েছি। এদের খরচ পত্র যা হবে সব দিয়ে, যা থাকবে তোমার কাছেই জমা রেখো।"

ইয়াশিন। নিশ্চয়ই তাই করবো।

কাশেম। তারপর রোগে-শোকে বিপদে-আপদে এই গুলনেয়ারকে রক্ষা করো।

এই কথা বলিতে বলিতে কাশেমের স্বর রুদ্ধ হইল। তিনি মনে

ভাবিলেন, সত্যই যদি গুলনেয়ারের কোন অসুখ হয়। আর সে অসুখ যদি খুব শক্ত হয়—ওঃ—”

কাশেম আর ভাবিতে পারিলেন না। তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে একটা ভাবের প্রবল উচ্ছ্বাস উঠিতেছিল, তাহা অনেক চেষ্টায় দমন করিয়া তিনি ইয়াশিনকে বলিলেন—“কেমন ভাই! এখন আমি স্বচ্ছন্দ চিত্তে যাইতে পারিব।”

ইয়াশিন কাশেমের পদধূলি লইয়া বলিল—“আশীর্ব্বাদ করুন দাদা, যেন খোদার কৃপায়, আমি এই কয়েক মাসের জন্য এ দায়িত্বভার বহন করিতে পারি।”

কাশেম ইয়াশিনকে আলিঙ্গননিবদ্ধ করিয়া—বিদায় দিলেন।

সে দিনের রাত্রিটা আসন্ন বিরহকাতর দম্পতি যুগলের হরিষে বিষাদে কাটিয়া গেল। হর্ষ-মিলনে। বিষাদ, ভাবী বিরহে। হর্ষে—এক এক সময় প্রাণ কদম্বপুষ্পের মত বিকশিত হইয়া উঠে—আর বিষাদে, যেন ঝটিকা তাড়িত প্রস্থনের মত ভয়ে কাঁপিতে থাকে।

হায়! প্রেমে যদি বিরহ না থাকিত?

প্রভাত আসিল। সময়, প্রেমোদ্ভ্রান্ত কিম্বা বিরহীর জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবে কেন?

ধরিতে গেলে সেদিনের প্রভাতটা গুল্ ও কাশেম কাহারও পক্ষে সুপ্রভাত নয়। কেন না সেই স্নিগ্ধ মলয়চুম্বিত, প্রভাতপ্রস্থনের সুরভি সম্ভার পরিপূরিত, বায়ুস্তরের বুকে তাহার সমুচ্চ দীর্ঘ নিশ্বাসটীকে রাখিয়া, আশঙ্কাকেম্পিত হৃদয়ে, কাশেম গুলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

আর গুল্! সে দেখিল—সুষমাভরা, বালার্কস্বর্ণকিরণ চুম্বিত সেই প্রভাত, যেন অমানিশার মত অন্ধকারময়! বিশ্ব প্রকৃতির বুকে যেন একটা বিষাদ মলিন ভাব।

বাতায়নের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, স্পন্দিত হৃদয়ে কম্পিত প্রাণে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কাশেমকে দেখা যায়, ততক্ষণ সে দেখিল। তারপর অশ্রুপূর্ণ নেত্রে, একটী হৃদয়ভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, মেঝের উপর পড়িয়া, খুব কাঁদিতে লাগিল।

আরও কতবার কাশিম নানা কাজের উপলক্ষ্যে, এই ভাবে, বিদেশে গিয়াছেন। কই আর কখনও ত তাহার মন এভাবে এতটা চঞ্চল হয় নাই। কে যেন তাহার প্রাণের মধ্য হইতে অস্ফুট বাণীতে বলিতেছে—"হায়! গুল্! কেন তুমি কাশেমকে ছাড়িয়া দিলে? তোমার সঙ্গে তার ত আর দেখা হইবে না।"

গুল্ যখন মেঝের উপর শুইয়া কাঁদিতেছে, সেই সময়ে আশীরা আসিয়া বলিল—"ছিঃ বিবি! কাঁদিলে যে বাছার আমার অমঙ্গল হইবে। কাঁদিও না মা! দুটো মাস বই তো নয়। তুমি অবুঝ হইলে আমি বুক বাঁধি কিরূপে?"

দাইএর কথায় গুল্ শান্তভাবে উঠিয়া বসিয়া, নেত্রমার্জ্জনা করিয়া রুদ্ধ স্বরে বলিল—"দাই মা!"

আশীরা। কেন মা!

গুল্। তাঁহাকে ত এর আগে আরও অনেকবার বিদেশে যাইতে দিয়াছি। কই—আর কখনত আমার মন এতটা চঞ্চল হয় নাই।"

আশীরা। ওটা মনের খেয়াল। তিনি আমাদের সুলতানের প্রতি-

নিধিরূপে দামাস্কসে গিয়াছেন। সঙ্গে ফৌজ্ লস্কর আছে। কার সাধ্য তাঁর অনিষ্ট করে।

গুল্। পথে শুনিয়াছি ডাকাতের বড় ভয়।

আশীরা। এক শো হাতিয়ার ওয়ালা ফৌজ্ যাদের সঙ্গে—ডাকাত তাদের কি কর্‌বে মা! খোদাকে ডাক। তিনিই কাশেমের রক্ষক হবেন।

এই ভাবের সান্ত্বনা বাক্যে গুল্ অনেকটা শান্তি পাইল।

সে সোৎসুকে প্রশ্ন করিল, "দাই মা! ইয়াশিন ফিরিয়া আসিয়াছে কি?"

আশীরা। শুনিয়াছি, সে কাশেমের সঙ্গে সহরের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যাইবে। তাহার ফিরিতে একটু বিলম্ব হইবে।

গুল্ বিমর্ষ চিত্তে বলিল—"এত বেলা হইয়াছে। বোধ হয় ইয়াশিন এখনি ফিরিবে। তাহাকে বলিও দাই মা—সে যেন আমার সঙ্গে একবার দেখা করে।"

আশীরা বলিল—"আমি এখনই তাহার সংবাদ লইতেছি।" এই কথা বলিয়া দাই চলিয়া গেল।

গুল্ সে দিন আহারে বসিল, কিন্তু আহারে তাহার রুচি নাই। কাশেম যে সব জিনিস খাইতে ভালবাসে, সে দিন সেই রকমের খাবারই তৈয়ারি হইয়াছিল। গুল্ তাহা মুখে দিতে পারিল না।

হাফেজ পড়িতে সে খুবই ভাল বাসিত। সে বই খানি খুলিয়া বসিল—যদি সেখানি পড়িয়া একটু শান্তি পায়।

অন্যমনস্ক ভাবে বইখানির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে সহসা একটী কবিতার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। তাহাতে লেখা আছে—

"অয়ি! প্রেমমুগ্ধে! প্রবাসগত প্রেমপাত্রের
জন্য তুমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিও না!
তাহার অনাগত বিপদাশঙ্কায় একটুও
অধীরা হইও না। জানিও, ভালবাসার
আকর্ষণ শক্তি বিদ্যুতের মত দ্রুতগামী।
সে যত দূরদেশেই থাকুক না
কেন—তোমার অশ্রুজল, তোমার
দীর্ঘ নিশ্বাস, তাহার মর্ম্মস্পর্শ
করিবেই করিবে। সে তাহাতে
আরও চঞ্চল ও ব্যথিত হইয়া উঠিবে।"

এই কবিতাটী গুলের বিরহ-সন্তপ্ত-প্রাণের সহিত বড়ই মিশ খাইল। সে মনে মনে ভাবিল—"জগতের মহাকবি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক। আর আমি তাঁর জন্য কাঁদিব না—আমার মর্ম্মভেদী নিশ্বাসে তাঁর প্রাণ ব্যথিত করিব না। যাহাতে তাঁর কষ্ট হইবে, মনোবেদনা হইবে, সে কাজ করিব কেন?"

গুল্ তখন প্রাণে শক্তি সঞ্চয় করিবার জন্য যুক্তকরে, ঊর্দ্ধনেত্রে উপরের দিকে চাহিয়া বলিল—"অনাথার আশ্রয়! মহাদুঃখে শান্তিদাতা মহিমাময় বিধাতা! আমার প্রাণে সাহস দাও, শক্তি দাও, সহিষ্ণুতা দাও। যেন আমি এই দীর্ঘকালব্যাপী বিরহে একটুও কাতরা না হই। তাঁকে সকল আপদ বিপদ হইতে রক্ষা কর। আমি তোমারই কৃপায়, সেই বহুমূল্য রত্নলাভ করিয়াছি। আমার সুখ, সম্পদ, আশা-ভরসা সবই যে তিনি!"

এইরূপে সেই বিশ্বস্রষ্টার চরণে একান্ত আত্মসমর্পণে গুলের মনে একটা শান্তি আসিল। তাহার বুকের ভিতর যে একটা ঝড় উঠিতেছিল, তাহার শক্তি লোপ হইল।

হায় রে! বিয়োগ বিধুরা—অভাগিনী রমণী!

সেই দিন অপরাহ্নে ইয়াশিন্ ফিরিয়া আসিয়া গুলের সহিত সাক্ষাৎ করিল।

ইয়াশিনকে দেখিয়াই গুল্ ব্যস্ত ভাবে, আর খুব একটা আগ্রহের সহিত প্রশ্ন করিল—"তাঁহাকে কত দূর অবধি অগ্রসর করিয়া দিলে ইয়াশিন?"

ইয়াশিন বলিল,—"আমি সহরের শেষ সীমা পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। আরও কিছু দূর তাঁর সঙ্গে যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি কোন মতেই আমাকে যাইতে দিলেন না।"

গুল্। তোমাকে আর কিছু বলিয়া দিলেন কি?"

ইয়াশিন। তেমন কিছু নয়। তবে তোমার যাহাতে কোন কষ্ট না হয়—

এ কথা শুনিয়া গুলনেয়ারের কণ্ঠস্বর, আবেগভরে রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তরে থাকিয়া কেবলমাত্র বলিল—"খোদা তাঁহাকে নিরাপদ করুন।"

ইয়াশিন বলিল—"তিনি আমার স্কন্ধে যে দায়িত্ব চাপাইয়া গিয়াছেন, তাহা আমি প্রাণপণে পালন করিব। তুমিও আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর গুল্—যখন তোমার সাংসারিক যে বিষয়ে কোনরূপ কষ্ট বা অসুবিধা হইবে, তাহা আমাকে গোপন করিবে না। তোমার সুখ স্বচ্ছন্দ বিধান আর তাঁর সম্পত্তি রক্ষা করাই এখন আমার সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য।"

গুল্‌নেয়ার বলিল—"তোমার মন কতটা উদার, তোমার দাদাকে তুমি তুমি কত ভালবাস, আর আমাকে কত স্নেহ কর, তাহা আমি জানি। তিনি যখন এখানে নাই, তখন তোমার কাছে কোনরূপ লজ্জা সংকোচ করিলে ত চলিবে না। এত দিন করি নাই যা, তা আজই বা করিব কেন? আচ্ছা! একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি ইয়াশিন! তাঁর নিকট কবে আমি পত্রের আশা কর্ত্তে পারি?"

ইয়াশিন বলিল—"তিনি ত নিশ্চিন্ত নন। সুবিধা পেলেই তোমায় সংবাদ দেবেন।"

গুল্‌নেয়ার, ইয়াশিনের চেয়ে বয়সে ছোট। এই জন্য সে তাহাকে কখনও বা গুল্, কখনও বা গুল্‌নেয়ার বলিয়া ডাকিত। গুল্ পাঁচ বৎসর হইল কাশেমের সংসারে আসিয়াছে। প্রথম প্রথম গুল্‌নেয়ার ইয়াশিনকে দেখিয়া একটু লজ্জা করিত। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মেলামেশায়, প্রথমকার সে লজ্জার ভাবটাও দূর হইয়া গিয়াছিল। এখন তাহারা ঠিক যেন ভাই বোন।

ইয়াশিন বলিল—"গুল্! তুমি বৃথা ভাবিয়া শরীর নষ্ট করিও না—চিত্তকে ব্যথিত করিও না। দুইটা মাস বইতো নয়? আজকার রাত্রিটা পোহাইলে ত দুই দিন হইয়া গেল। এইরূপে এই দুটো মাসও দেখিতে দেখিতে কালস্রোতে ভাসিয়া যাইবে। কাশেম যে কাজে দামাস্কসের সুলতানের কাছে গিয়াছেন, সে কাজটী বড়ই দায়িত্বপূর্ণ। সে কাজটা শেষ করিয়া আসিতে পারিলে নিশ্চয়ই এবার তিনি আমাদের বসোরা রাজ্যের একজন গণনীয় উজীর হইবেন। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে উৎসুক নেত্রে চাহিয়া থাক গুল্! তোমার সকল ভয় ভাবনাই সহ্য করিবার ক্ষমতা জন্মিবে।"

এই কথা বলিয়া ইয়াশিন বিদায় লইয়া তাহার বাড়ীতে চলিয়া গেল।

কাশেম ও ইয়াশিনের বাড়ী পাশাপাশি। মাঝে কেবলমাত্র একটী প্রাচীর ব্যবধান। প্রাচীরের গায়ে যে দোরটী আছে, তাহা খুলিয়া রাখিলে দুইটী বাড়ীই ধরিতে গেলে এক।

এই হেতু এক সঙ্গে বহুদিন পাশাপাশি বাস করার জন্য মাঝের এ দোরটী অনেক সময়ই খোলা থাকিত।

ইয়াশিন বিবাহ করিয়াছিল। কিন্তু প্রায় এক বৎসর হইতে যায়, তাহার পত্নী বিয়োগ হইয়াছে। কাশেম তাহাকে বহুবার বিবাহ করিবার জন্য অনুযোগ করিয়াছিলেন, এমন কি দুই একটী সুন্দরী পাত্রীও স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ইয়াশিন অন্য বিষয়ে ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামী হইলেও এ বিবাহের অনুরোধটী রক্ষা করে নাই।

কাশিম, বসোরার সুলতানের মুকিম বা দরবারী মণিকার। বাদশার মুকিম বলিয়া সহরে তাঁর সম্মানও বেশী। আর ব্যবসায়ও বেশ চলিতেছিল।

ইয়াশিন সুশিক্ষিত, ধীর, মেধাবী, বিশ্বাসী আর চিরানুগত। এজন্য কাশেম তাহাকে তাঁহার কারবারের সিকি অংশ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই সিকি অংশের লাভেই ইয়াশিনের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। একান্ত বিশ্বাসে কাশেম, কারবারের সমস্ত কাজকর্ম্ম তাঁহার আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ এই ইয়াশিনকেই সঁপিয়া দিয়াছিলেন। তবে তিনি মধ্যে মধ্যে এক একবার দেখিয়া আসিতেন, ইয়াশিন কি ভাবে কাজকর্ম্ম করিতেছে। তবে রাজ দরবারের যে সব কাজ পড়িত, কাশেম তাহা নিজেই করিতেন। দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই তিনি তাঁহার জীবনাধিকা সুন্দরী পত্নী গুলের সাহচর্য্যে কাটাইয়া, এই মর্ত্যে স্বর্গের সুখ অনুভব করিতেন।

ইয়াশিনের সংসারে কেবল তাহার বৃদ্ধা মাতা। তবে সংসারের কাজকর্ম্ম করিবার জন্য কয়েকজন বাঁদী ও বান্দা ছিল।

ইয়াশিন নিজে একজন সুবাদক ছিল। এই জন্য তাহার বাটীতে মাঝে মাঝে সঙ্গীতের বৈঠক হইত। তাহাতে ইয়াশিনের কিছু খরচপত্রও হইত। কাশেম অনেক সময় আনন্দের সহিত এই সব আনন্দ-মজলিসে যোগদান করিতেন।

কাশেমকে বিদায় দিয়া ইয়াশিন বড়ই মনঃক্ষুণ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কি যেন একটা দুশ্চিন্তার ছায়া, তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। সে ভাবিল—"হায়! কেন এবার কাশেমের জন্য আমার প্রাণ এত চঞ্চল হইতেছে?"

সবারই যখন দিন কাটে, তা ভালতেই হউক, আর মন্দতেই হউক, তখন গুলের দিন কাটিবে না কেন?

তাহার দিনগুলি কাটিতেছে বটে, কিন্তু আগেকার মত নয়। যে ধূসরবরণা উষার জ্যোতি—তাহার প্রাণকে প্রভাতের প্রাক্কালে একটা স্বর্গীয় স্নিগ্ধ ভাবে উচ্ছ্বসিত করিয়া দিত - এখন সেই উষাও যেন তাহার পক্ষে জ্বালাময়। উষার স্নিগ্ধস্পর্শ বায়ু হইতে, যেন প্রভাত কুসুমের গন্ধ ঝরিয়া পড়িতেছে। মধ্যাহ্নে রবিকরের সে উজ্জলতা নাই। সায়াহ্নে সন্ধ্যাসুন্দরীর আগমনে প্রকৃতির ভাব-পরিবর্ত্তনে, তার মনে সেরূপ একটা আনন্দ নাই। আর নিশা—তাহা অতি দীর্ঘ। বড়ই দুঃস্বপ্নময়! আকাশের তারকা হইতে যেন উজ্জ্বলতা চলিয়া গিয়াছে। নীলাকাশে যে চাঁদ নিত্য উঠে, তাহার কলঙ্কটা যেন খুব বাড়িয়া গিয়াছে। যে সব নৈশ কুসুম ফুটিয়া, স্নিগ্ধ মলয়ের উপর বসিয়া, তাহার বাতায়ন মধ্যে প্রবেশ করিয়া, গৃহ কক্ষকে নিত্য সুবাস ব্যাকুলিত করিত, তাহা হইতে যেন সকল সুবাস চলিয়া গিয়াছে।

এই কথা বলিয়া ইয়াশিন বিদায় লইয়া তাহার বাড়ীতে চলিয়া গেল।

কাশেম ও ইয়াশিনের বাড়ী পাশাপাশি। মাঝে কেবলমাত্র একটী প্রাচীর ব্যবধান। প্রাচীরের গায়ে যে দোরটী আছে, তাহা খুলিয়া রাখিলে দুইটী বাড়ীই ধরিতে গেলে এক।

এই হেতু এক সঙ্গে বহুদিন পাশাপাশি বাস করার জন্য মাঝের এ দোরটী অনেক সময়ই খোলা থাকিত।

ইয়াশিন বিবাহ করিয়াছিল। কিন্তু প্রায় এক বৎসর হইতে যায়, তাহার পত্নী বিয়োগ হইয়াছে। কাশেম তাহাকে বহুবার বিবাহ করিবার জন্য অনুযোগ করিয়াছিলেন, এমন কি দুই একটী সুন্দরী পাত্রীও স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ইয়াশিন অন্য বিষয়ে ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামী হইলেও এ বিবাহের অনুরোধটী রক্ষা করে নাই।

কাশিম, বসোরার সুলতানের মুকিম বা দরবারী মণিকার। বাদশার মুকিম বলিয়া সহরে তাঁর সম্মানও বেশী। আর ব্যবসায়ও বেশ চলিতেছিল।

ইয়াশিন সুশিক্ষিত, ধীর, মেধাবী, বিশ্বাসী আর চিরানুগত। এজন্য কাশেম তাহাকে তাঁহার কারবারের সিকি অংশ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই সিকি অংশের লাভেই ইয়াশিনের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। একান্ত বিশ্বাসে কাশেম, কারবারের সমস্ত কাজকর্ম্ম তাঁহার আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ এই ইয়াশিনকেই সঁপিয়া দিয়াছিলেন। তবে তিনি মধ্যে মধ্যে এক একবার দেখিয়া আসিতেন, ইয়াশিন কি ভাবে কাজকর্ম্ম করিতেছে। তবে রাজ দরবারের যে সব কাজ পড়িত, কাশেম তাহা নিজেই করিতেন। দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই তিনি তাঁহার জীবনাধিকা সুন্দরী পত্নী গুলের সাহচর্য্যে কাটাইয়া, এই মর্ত্ত্যে স্বর্গের সুখ অনুভব করিতেন।

ইয়াশিনের সংসারে কেবল তাহার বৃদ্ধা মাতা। তবে সংসারের কাজকর্ম্ম করিবার জন্য কয়েকজন বাঁদী ও বান্দা ছিল।

ইয়াশিন নিজে একজন সুবাদক ছিল। এই জন্য তাহার বাটীতে মাঝে মাঝে সঙ্গীতের বৈঠক হইত। তাহাতে ইয়াশিনের কিছু খরচপত্রও হইত। কাশেম অনেক সময় আনন্দের সহিত এই সব আনন্দ-মজলিসে যোগদান করিতেন।

কাশেমকে বিদায় দিয়া ইয়াশিন বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। কি যেন একটা দুশ্চিন্তার ছায়া, তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। সে ভাবিল— "হায়! কেন এবার কাশেমের জন্য আমার প্রাণ এত চঞ্চল হইতেছে?"

সবারই যখন দিন কাটে, তা ভালতেই হউক, আর মন্দতেই হউক, তখন গুলের দিন কাটিবে না কেন?

তাহার দিনগুলি কাটিতেছে বটে, কিন্তু আগেকার মত নয়। যে ধূসরবরণা উষার জ্যোতি—তাহার প্রাণকে প্রভাতের প্রাক্কালে একটা স্বর্গীয় স্নিগ্ধ ভাবে উচ্ছ্বসিত করিয়া দিত--এখন সেই উষাও যেন তাহার পক্ষে জ্বালাময়। উষার স্নিগ্ধস্পর্শ বায়ু হইতে, যেন প্রভাত কুসুমের গন্ধ ঝরিয়া পড়িতেছে। মধ্যাহ্নে রবিকরের সে উজ্জ্বলতা নাই। সায়াহ্নে সন্ধ্যাসুন্দরীর আগমনে প্রকৃতির ভাব-পরিবর্ত্তনে, তার মনে সেরূপ একটা আনন্দ নাই। আর নিশা—তাহা অতি দীর্ঘ। বড়ই দুঃস্বপ্নময়! আকাশের তারকা হইতে যেন উজ্জ্বলতা চলিয়া গিয়াছে। নীলাকাশে যে চাঁদ নিত্য উঠে, তাহার কলঙ্কটা যেন খুব বাড়িয়া গিয়াছে। যে সব নৈশ কুসুম ফুটিয়া, স্নিগ্ধ মলয়ের উপর বসিয়া, তাহার বাতায়ন মধ্যে প্রবেশ করিয়া, গৃহ কক্ষকে নিত্য সুবাস ব্যাকুলিত করিত, তাহা হইতে যেন সকল সুবাস চলিয়া গিয়াছে।

তাহার সাধের বীণা অনাদরে পড়িয়া ধূলি ধূসরিত হইতেছে। সঙ্গীত চর্চ্চার অভাবে, তাহার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ বেসুরা ও বেথাপ হইয়া উঠিয়াছে। গুলেস্তাঁ, হাফেজ, চাহার-দরবেশ তার বড়ই প্রিয় গ্রন্থ। সে সব বহি এখন ধূলিধূসরিত। হাফেজের প্রত্যেক কবিতায় যেন বিরহের সুর মাখা। সে কবিতা পড়িলে, যেন আলেয়া ভৈরবীর করুণ সুর ভাসিয়া উঠে। সেইজন্য সে মাঝে মাঝে হাফেজের পাতা উল্টাইয়া, তাহা বিরক্তির সহিত বন্ধ করিয়া রাখে।

ইয়াশিন প্রতিদিনই তাহার সঙ্গে একবার করিয়া দেখা করিয়া যায়। এ দেখা সাক্ষাতে, পূর্ব্বের সেই স্নেহ, কুশল জিজ্ঞাসার মামুলী ভঙ্গী, সান্তনা আর সহানুভূতি, যেন একটু ঘোরালো হইয়া পড়ে। গুল্ মনে মনে ভাবে, তাহার এই দুর্দ্দিনে খোদা তাহাকে এক সহোদর তুল্য সহায় আনিয়া দিয়াছেন।

কাশেম প্রথম প্রথম নিয়মিতরূপে পত্রাদি দিয়াছিল। কেননা বসোরার সুলতানের রাজ্যের সীমার মধ্যে সে যতদিন ছিল, ততদিন তাহার পত্রবাহী লোকের অভাব ছিল না।

বসোরাধিপের রাজ্য ছাড়াইয়া অপর রাজ্যে গিয়া পড়িবার পরও, সে বসোরাগামী সার্থবাহদিগের মারফৎ তাহার প্রিয়তমাকে পত্রাদি পাঠাইত। কিন্তু ইদানীং পত্রাদি আসা একেবারে বন্ধ হইয়া পড়ায়, গুল্ বড়ই ভাবিতা হইয়া উঠিল।

একদিন সে ইয়াশিনকে বলিল—"ভাই ইয়াশিন! সাহেবের কোন সংবাদ পাইতেছি না কেন? আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে।"

ইয়াশিন বলিল—"যতদিন তাঁহার পত্র পাঠাইবার সুবিধা ছিল, ততদিন

তোমাকে আর আমাকে একই ভাবে চিঠিপত্র পাঠাইয়াছেন। কিন্তু এদানীং তাঁহার চিঠিপত্র আমিও পাইতেছি না। কেবল ত তিনি একা নহেন, তাঁর সঙ্গে দুইজন সম্ভ্রান্ত উজীর গিয়াছেন। তাঁহারাও তাঁহাদের বাড়ীতে কোন সংবাদ পাঠান নাই। ব্যাপার যে কি, কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না।

গুল্ কি ভাবিয়া বিষণ্ণমুখে ছলছল নেত্রে বলিল—"তাহা হইলে তাঁর সংবাদ আনাইবার কি কোন উপায় নাই ইয়াশিন? আমার যাহা কিছু অলঙ্কার আছে সব তোমায় দিতেছি। এগুলি বিক্রয় করিয়া কোন লোককে প্রচুর অর্থ দিয়া নিযুক্ত করিয়া, তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দাও না কেন?"

ইয়াশিন বলিল,—"তাঁহার কাছে লোক পাঠানই ত দুষ্কর। তার উপর পথের মধ্যে দস্যুর ভয় খুব বেশী বলিয়া, কেহই যাইতে স্বীকার করিবে না যে গুল্!

গুল্ এই কথা শুনিয়া, একটা জ্বালাময় হৃদয় লইয়া, তাহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দরোজা বন্ধ করিয়া দিল। মাটীতে পড়িয়া সে অবোধ বালিকার মত অনেক কাঁদিল। হায়! কাঁদিলে কি দূরে গত, প্রিয়জনকে কাছে পাওয়া যায়?

(৩)

ইয়াশিন, এই অশান্ত চিত্ত গুল্‌কে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িল। কয়েক দিনের বিরহেই যে এতটা অধীরা, তাহাকে সান্ত্বনা করা বড় সহজ ব্যাপার নয়! কে জানে কাশেম কবে ফিরিবে? দিনরাত কান্না, দীর্ঘ নিশ্বাস ত আর সহিতে পারা যায় না।

ইয়াশিন সেদিন সন্ধ্যার পর দাইকে ডাকিয়া তাহাকে বলিল—"দেখ

আশীরা! কাশেমের জন্য গুল্‌নেয়ার দিন রাত কাঁদাকাটা করিতেছে। বলিলে বোঝে না। আমিও আমার বন্ধুর সংবাদ আগে ঠিক নিয়মিত পাইতেছিলাম। আজ পনর দিন হইতে আর কোন খপরই নাই। কি করিয়া গুল্‌কে শান্ত করিব, কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি উহার উপর একটু দৃষ্টি রাখিও। মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া উহাকে একটু তুষ্ট রাখিও। আমি সহরে সংবাদ আনিতে চলিলাম!"

আশীরা দাই বলিল—"আমি ও কি তা দেখতে পাচ্ছিনা সাহেব! কাশেম সাহেব ত এর আগে আরও কতবার বিদেশে গিয়েছেন। তাতে দুমাস চার মাস পর্য্যন্তও কেটে গেছে। তখন ত গুল্ এতটা কাতর হয়নি। ও সর্ব্বদাই আমায় বলে—এবার ওর মনে যেন একটা অমঙ্গলের ছায়া দেখা দিচ্ছে। হয়ত কাশেম আর ফিরে আসবে না।"

ইয়াশিন—কি একটা ভাবিয়া বলিল—"ও সব বাজে কথা! হয় ত আর মাস খানেকের মধ্যে কাশেম সাহেব ফিরে আসবেন। হয় ত পাঁচ সাত দিনের মধ্যে তাঁর খবর এসে পড়বে। যাই হোক্, তুমি একটু সাবধানে থেকো—গুল্‌কে চোখে চোখে রেখো।"

ইয়াশিন দাইকে ত এইভাবে উপদেশ দিয়া সহরে চলিয়া গেল। কিন্তু সে বুঝিল, কাশেম সাহেবের বিষয়আশয়ের কাজ দেখা, আর সংসার চালানোর চেয়ে, এই অশান্ত গুল্‌নেয়ারকে শান্ত রাখা বড়ই শক্ত কাজ। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? সে স্বেচ্ছায় যে দায়িত্বময় কর্ত্তব্যভার নিজের স্কন্ধে লইয়াছে—যে উপায়েই হউক তাহাকে তাহা পালন করিতে হইবে।

এইভাবে আরও দুই চারি দিন কাটিয়া গেল। তবুও কাশেমের কোন সংবাদ নাই! ইয়াশিন এজন্য বড়ই ভাবিত হইল। কেবল ত কাশেমের

সংবাদ নহে—যে তুই জন পদস্থ উজীর, কাশেমের সঙ্গে গিয়াছিলেন—তাঁহাদেরও বাটীতে কোন সংবাদ আসে নাই। সে বাড়ীর পরিজনেরাও, গুলের মত কাঁদাকাটা করিতেছে। কিন্তু তাহাদের জন্য ইয়াশিনের অতটা মাথা ব্যথা ছিল না। গুলের চোখে যে অশ্রুধারা গড়াইতেছে, সে যে মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে, তাহার সুন্দর কান্তিতে যে কালিমা পড়িতেছে, আতপতাপবিদগ্ধ উদ্যান কুসুমের ন্যায়, সে যে দিনে দিনে শুকাইয়া যাইতেছে, তাহা দূরীকরণের উপায় কই? তাহাকে সান্ত্বনা করিবার পথ কই?

কাশেমের উন্নতচরিত্র, সত্যবাদিতা, পত্নীর প্রতি গভীর মমতা ও তাহার উপর অগাধ স্নেহের কথা ত সে জানে। ইচ্ছাকৃত ত্রুটি করিয়া কাশেম যে তাহাদিগকে কোন সংবাদ দিতেছে না, তাহাও সে বিশ্বাস করিতে স্বীকৃত নহে! তবে কেন এমন ঘটিল?

সহসা তাহার মনে ভীষণ মরু-দস্যুদের কথা জাগিয়া উঠিল। বসোরার ও দামাস্কসের সুলতানগণ বহু চেষ্টা করিয়াও ইহাদের আয়ত্ত করিতে পারিতেছিলেন না। অতি দুর্দ্ধর্ষ, প্রতিহিংসা-পরায়ণ, মহাশক্তিশালী, ক্ষমাজ্ঞান-পরিশূন্য, ভয়ানক নিষ্ঠুর এই বেদুইন জাতি। তাহাদের দলে হাজার হাজার লোক। এই দামাস্কসের সুলতানের উপর তাহাদের বিজাতীয় ক্রোধ। কেননা দামাস্কসের সুলতানই তাহাদের ধরপাকড় করিবার জন্য বহুদিন হইতে বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন।

আর বসোরার সুলতানের লোকজন, বহুমূল্য মণিমাণিক্য লইয়া যে দামাস্কসের সুলতানের সহিত আত্মীয়তা করিতে যাইতেছে—এ সংবাদটা জানাও তাহাদের পক্ষে দুরূহ নহে। এই বসোরাবাসীর মধ্যেও তাহাদের অনেক গোয়েন্দা আছে। এমন কি সুলতানের অতি বিশ্বাসী কর্ম্মচারীদের মধ্যে

দুই চারি জন, গুপ্তহত্যাজনিত প্রাণের ভয়ে, তাহাদের অতি গোপনে, সাহায্য করেন। এই সব রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ, উক্ত ভীষণ দস্যু সম্প্রদায়ের অর্থে ক্রীত, আবার কেহ বা সপরিবারে গুপ্তভাবে দস্যুদের হস্তে নিহত হইবার ভয়ে, তাহাদের গোপনে সাহায্য করিয়া থাকেন। মনে করিলে বসোরার সুলতানের, দুই একশত সৈন্যকে, এই দস্যুদল পিশিয়া মারিতে পারে।

ইয়াশিন মনে মনে ভাবিল—তাহা হইলে সত্য সত্যই কি এরূপ কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে? হায়! তাহা হইলে কি হইবে?

রাত্রি তখন প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া, দ্বিতীয় প্রহরের অতি সন্নিকট। সে দিন আকাশটাও একটু মেঘাচ্ছন্ন। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে-ছিল। অদূরে প্রচণ্ড তরঙ্গময়ী টাইগ্রীস্, প্রবল বায়ুর তাড়নে—লহরলীলা তুলিয়া, মৃদুনাদে গর্জ্জন করিতেছিল। ইয়াশিন দ্রুত পদে পথ চলিতেছে। কেননা এই দুর্য্যোগ জন্য রাজপথে লোকজন নাই বলিলেই হয়।

এমন সময়ে ইয়াশিন, সহসা তাহার পিছনে যেন কাহারও সাবধান বিক্ষিপ্ত, পদ শব্দ পাইল। সে ত্বরিত গতিতে পথিপার্শ্ববর্ত্তী এক বারান্দার নীচে আত্মগোপন করিল। এই অনুসরণকারী লোকটাকে—একবার তাঁহার দেখা দরকার। কারণ এরূপ দুর্য্যোগময়ী অন্ধকারময় নিশীথে—বসোরার রাজপথ অনেক সময় বিপদ শূন্য নহে। রাহাজান দস্যু ও অর্থলোভে আক্রমণকারী নিষ্ঠুর হৃদয় বেদুইন আরব, বসোরা সহরে যথেষ্ট।

যে লোকটা তাঁহার পিছনে পিছনে আসিতেছিল সে তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল—"সাহেব! আপনি কি এই পল্লীর অধিবাসী?"

ইয়াশিন অন্ধকারে সেই লোকটাকে ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। বলিল—"হাঁ—একটু আগেই আমার বাড়ী।"

আগন্তুক। এই পল্লীতে কাশেম সাহেব কোন বাড়ীতে থাকেন আমায় দয়া করিয়া দেখাইয়া দিতে পারেন কি ?

ইয়াশিন। কাশেম সাহেব ? কোন কাশেম ?

আগন্তুক। যিনি বসোরার সুলতানের মুকিম।

ইয়াশিন। তিনি ত দামাস্কসের পথে ! প্রায় একমাস হইল, তিনি সুলতানের প্রতিনিধিরূপে দামাস্কসে গিয়াছেন। তিনি ত বাড়ীতে নাই।

আগন্তুক। তা আমি জানি। তাঁহার নিকট হইতেই আমি আসিতেছি। আমি চাই তাঁর বন্ধু ও খুল্লতাত পুত্র ইয়াশিন সাহেবকে।

ইয়াশিন। কেন—ইয়াশিনকে আপনার কি প্রয়োজন ? কে আপনি ?

আগন্তুক। প্রকাশ্য রাজপথে আমার পরিচয় দিতে আমি ইচ্ছুক নই। আর পরিচয় দিতেই যদি হয়, তাহা ইয়াশিনকে দিব। ইহার অনেক কারণ আছে। আপনি আমায় কাশেম সাহেবের বাড়ীটি দেখাইয়া দিন। আমি সে বাড়ীতে পৌঁছিলেই—ইয়াশিনকে খুঁজিয়া লইতে পারিব। আর এজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দিব।

আগন্তুকের কথার ভঙ্গীতে ইয়াশিন বড়ই সন্দিগ্ধ হইল। সে মনে মনে সাত পাঁচ...ভাবিয়া—বলিল—"আমার নামই ইয়াশিন ? আমিই কাশেম সাহেবের খুল্লতাত পুত্র।"

আগন্তুক। ভালই হইল। খোদা দেখিতেছি—আমার সহায়। তা না হইলে এত সহজে আমি আপনাকে পাইতাম না।

ইয়াশিন। আপনার কি প্রয়োজন আমায় এখানেই বলিতে পারেন।

আগন্তুক সশঙ্কিতভাবে একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিল—"না—না—সে সব সাংঘাতিক কথা এখানে বলিবার নয়। আপনি আমার কথার উপর বিশ্বাস করুন। বড়ই একটা সাংঘাতিক সংবাদ আমি আপনার জন্য আনিয়াছি।"

ইয়াশিনের বাড়ী খুব কাছে। আর একটা মোড় ফিরিলেই দেখা যায়।

সে মনে মনে ভাবিল, কে এই অদ্ভুত আগন্তুক? এর ভাবগতিক যে ষোল আনাই রহস্যপূর্ণ! কিন্তু এ যখন বলিতেছে—কাশেমের সম্বন্ধে সে এক সাংঘাতিক সংবাদ আনিয়াছে, তখন ইয়াশিনের মনটা বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে বলিল—"তাহা হইলে আসুন আমার সঙ্গে।"

দুই জনে তখন নির্ব্বাক অবস্থায়, সেই অন্ধকাররাশি মথিত করিয়া পথ চলিতে লাগিল।

ইয়াশিন তাহার বাটীর দ্বারে পৌছিয়া, সবলে বাহিরের কড়া ধরিয়া নাড়া দিল। তখনই এক গোলাম, আলোকহস্তে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। তাহার প্রভুর সমভিব্যাহারী, সেই ভীষণ দর্শন আগন্তুকের বস্ত্রাবৃত মূর্ত্তি দেখিয়া, সে খুবই বিস্মিত হইল। ইয়াশিনও যে মনে মনে একটু ভয় না পাইয়াছিল, তাহা নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কাশেমের সংবাদ আনিয়াছে—সে যাহাই হউক না কেন, তাহার সম্মানিত অতিথি। কাজেই ইয়াশিন দ্বিধাসংকোচহীন হৃদয়ে সেই আগন্তুককে লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। গোলাম বৈঠকখানার চাবিটী খুলিয়া দিল।

বাহিরের যে ঘরটীতে ইয়াশিন তাহার বন্ধুবান্ধবদের বসাইত, এই আগন্তুককে সঙ্গে লইয়া, সে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

৪

কক্ষ দীপালোকে উজ্জ্বলিত। এতক্ষণ ইয়াশিন এই আগন্তুকের মূর্ত্তি ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পায় নাই। এখন সবিস্ময়ে দেখিল, সে একজন বেদুইন আরব।

তাহার চেহারাখানা শূরবীরের মত। চক্ষু দুইটা বাঘের চোখের মত জ্বলিতেছে। বহুদূর পথ চলিয়া আসিলে মুখে যেরূপ একটা অবসন্ন ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহার সেই ভীষণ মুখে যেন সেইরূপ একটা ক্লান্তিময় ভাব।

লোকটা ইয়াশিনকে একদৃষ্টে তাহার দিকে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া নির্ব্বাক অবস্থায় চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, মৃদু হাস্যের সহিত বলিল—"আমায় সন্দেহ করিতেছেন ইয়াশিন সাহেব?"

ইয়াশিন তাহার কথায় যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। কিন্তু সে ভাবটা সে তখনই সামলাইয়া বলিল—"না—তা নয়। তবে—"

আগন্তুক বলিল—"তবে—অর্থাৎ কথাটা হইতেছে এই, এত রাত্রে একজন বেদুইন আপনার সঙ্গে নিভৃতে দেখা করিতে আসিয়াছে—এটা অবশ্য সন্দেহের কথা। আমি শীঘ্রই আপনার সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছি। পাকা সাতটা ক্রোশ পথ, মরুভূমির মধ্য দিয়া উটের পিঠে সওয়ার হইয়া আসিতেছি। এ জন্য বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত আমি। একটু কফি ও কিছু খাদ্য, আমার বড়ই প্রয়োজন। সুস্থ না হইলে আমি আপনাকে কোন কথাই বলিতে পারিতেছি না।"

ইয়াশিন তখনই কক্ষান্তরে উঠিয়া গিয়া, সেই গোলামকে কফি প্রস্তুত করিতে আদেশ করিল। সুচতুর প্রভুভক্ত ভৃত্যও, প্রভুর প্রয়োজন বুঝিয়া সেই কার্য্যে পূর্ব্বেই মনোনিবেশ করিয়াছিল।

অল্পক্ষণ পরেই, গোলাম কফি ও পিষ্টকাদি আনিল। আগন্তুক একটা আগ্রহের সহিত কফিপাত্র ও খাদ্যাদি নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া বলিল—"আঃ! সুস্থ হইলাম। এখন আপনাকে সমস্ত কথা গুছাইয়া বলিতে পারিব।"

ইয়াশিন বলিল—"কিছু মাংস ও রুটী আনাইব কি?"

আগন্তুক সহাস্যে বলিল—"না তাহার কোন প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন হইলে আমি নিজেই তাহার জন্য বলিতাম। এই সাত ক্রোশ পথ একদমে চলিয়া আসিয়াছি। আবার এই পথটা আজ রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই আমায় ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

ইয়াশিন লোকটার কথায় অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিল—"কে আপনি? আপনার প্রকৃত পরিচয় পাইলে আমি বড়ই সুখী হইব।"

আগন্তুক মৃদু হাস্যের সহিত বলিল—"যখন দশ পনর মিনিটের মধ্যে আমাদের কাজ মিটিয়া যাইবে, তখন আমার পরিচয়টা নাই বা জানিলেন। আমার পরিচয়ে আপনার কোন ইষ্ট লাভ হইবে না। পরন্তু আমিই নিজে বিপদে পড়িব। যাই হ'ক কথাগুলি আপনাকে চট্‌পট্‌ বলিয়া ফেলিতেছি। রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিলম্বে আমারই ক্ষতি—কেননা আজ রাত্রে যদি আমি নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়া যাইতে না পারি, তাহা হইলে হয় ত আমার প্রাণ পর্য্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে।"

এই কথা বলিয়া সেই আগন্তুক একটী ক্ষুদ্র বুচকী খুলিয়া একখানি তস্‌বীর ও একটী অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া, ইয়াশিনের সম্মুখে রাখিয়া বলিল—"এ তস্‌বীর ও অঙ্গুরীয় কার আপনি চিনিতে পারেন কি?"

ইয়াশিন সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"এ যে কাশেমের অঙ্গুরীয়! এ যে—গুল্‌নেয়ারের তস্‌বীর! আপনি এগুলি পাইলেন কোথায়?"

আগন্তুক। কাশেমের নিকট হইতেই আমি এগুলি আপনাকে দিবার জন্য পাইয়াছি। এই গুল্‌নেয়ার ত কাশেমের বিবি। তাঁহাকেই এই তসবীর খানি ও আংটিটি দিবেন।"

ইয়াশিন সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"সে কি? কাশেম কোথায়?"

আগন্তুক। কাশেম বেদুইন দস্যু হস্তে বন্দী। তার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন। হয়ত আমি ফিরিয়া গিয়া তাহাকে জীবিত দেখিতে পাইব না।

ইয়াশিন। বলেন কি সাহেব? আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?

আগন্তুক। কেমন করিয়া জানিলাম—তাহার প্রমাণের ভার আমার উপর। যাহারা কাশেম ও তাহার সঙ্গীদের বন্দী করিয়াছিল, আমি তাহাদের মধ্যে একজন। আর কাশেমকে যে কারাগারে রাখা হইয়াছে, তাহার প্রধান রক্ষী আমি।

ইয়াশিন। বসোরার সুলতানের সে দুইজন উজীর কোথায়?

আগন্তুক। তাহাদের হত্যা করা হইয়াছে?

ইয়াশিন। হত্যা করা হইয়াছে! কেন?

আগন্তুক। আমাদের দলপতির ইচ্ছা ও প্রয়োজন।

ইয়াশিন। কাশেমকে এ পর্য্যন্ত হত্যা করা হয় নাই কেন?

আগন্তুক। সেও দলপতির ইচ্ছা। তবে তার জীবন রক্ষার ব্যাপারে আমারও একটু চেষ্টা আছে।

ইয়াশিন। কাশেমের জীবন রক্ষায় আপনার কি স্বার্থ?

আগন্তুক। আমরা অর্থলোভী লুণ্ঠনকারী বেদুইন দস্যু। জহরত আর সোণারূপা ভিন্ন, এ দুনিয়ায় আমরা কিছু ছুঁই না ও চিনি না। যদি বন্দীদের নিকট আমরা পাইবার মত কিছু পাই, তাহা হইলে তাহার

কারাগারের কষ্ট কমাইয়া দিই, হয়ত সুযোগ পাইলে তাহাকে মুক্তি দিই—কিম্বা বিনা যন্ত্রণায় যাহাতে তাহাকে হত্যা করা হয় তার ব্যবস্থা করি।"

ইয়াশিন। কাশেমের নিকট আপনি কত টাকা পাইয়াছেন যে তার প্রতি এতটা করুণা প্রকাশ করিতেছেন?

আগন্তুক। খুব একখানা দামী নালা। সেখানা বেচিলে আমি হাজার খানেক স্বর্ণমুদ্রা পাইব। আর একটা আংটী। এটার দাম কোন্‌না পাঁচশো হইবে?

ইয়াশিন। কাশেম এখন কোথায়?

আগন্তুক। আমাদের কারাগারে।

ইয়াশিন মনে মনে কি ভাবিল। তৎপর বলিল—"কাশেমকে রক্ষা করিবার কোন উপায়ই কি নাই?"

আগন্তুকের চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ইয়াশিনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আছে! প্রচুর অর্থ! আপনি কাশেমের জীবনের মূল্য কত দিতে পারেন সাহেব?"

ইয়াশিন। কত আপনি চান?

আগন্তুক। দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা!

ইয়াশিন। কবে দিতে হইবে?

আগন্তুক। এই মুহূর্ত্তে!

ইয়াশিন সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া, বড়ই দমিয়া পড়িয়াছিল। কাশেম যে তাহার আবাল্য-সুহৃৎ—রক্ত সম্পর্কে খুব আপনার। তার যা কিছু উন্নতি সৌভাগ্য, সবই ত এই কাশেমের জন্য। সে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বন্ধুকে বিপদমুক্ত করিবার সংকল্প করিল। এইজন্য সে সেই আগন্তুককে বলিল—"সাহেব! আপনি যে অঙ্গুরীয় দেখাইলেন—সত্যই তাহা কাশেমের নামাঙ্কিত।

কিন্তু এই অঙ্গুরীয় দু'টী কাশেমের মৃত্যুর পরও আপনার হস্তগত হওয়া সম্ভব। আপনি আর কোন বিশ্বাস যোগ্য নিদর্শন আমায় দেখাইতে পারেন কি ?"

আগন্তুকের অদ্ধ মলিন পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া, আর সে যে একজন বেদুইন দস্যু—তাহা জানিতে পারিয়া, ইয়াশিনের মনে একটা দারুণ সন্দেহ জন্মিয়াছিল।

আগন্তুককে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া ইয়াশিন পুনরায় বলিল—"আর কিছু বিশ্বাসযোগ্য নিদর্শন আপনি দেখাইতে পারেন কি ?"

আগন্তুক তাহার মাথার ফেজ টুপিটা খুলিয়া, তাহার মধ্য হইতে এক খণ্ড সাদা কাগজ বাহির করিয়া বলিল—"এই ক্ষুদ্র চিঠিখানা পড়ুন। আপনার সকল সন্দেহ দূরীভূত হইবে। কাশেমের হাতের লেখা ত আপনি চেনেন ?"

ইয়াশিন ব্যস্তভাবে সেই পত্রখণ্ড খুলিবামাত্রই দেখিল—তাহা যেন মলিন লালবর্ণের কালিতে লেখা। আর এই ক্ষুদ্র পত্রের দুই এক স্থানে শোণিত চিহ্নও যেন লাগিয়াছে।

ইয়াশিন ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সেই শোণিত-রেখা-রঞ্জিত পত্রখানি হাতে করিবার শক্তি যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার লোপ হইল। সে সবিস্ময়ে বলিল—"এ পত্রে শোণিত চিহ্ন আসিল কিরূপে ?'

আগন্তুক। ওটা কাশেমের অঙ্গুলির শোণিত। পত্রখানা সে তাহার দেহের রক্তেই লিখিয়াছে! বন্দীকে কালি কলম দেওয়া, আমাদের আইনে বড়ই ভয়ানক অপরাধ। সুতরাং সে আপনাকে এই পত্রখানি লিখিবার সময়, ছুরী দিয়া নিজের বাম অঙ্গুলির এক স্থান বিদ্ধ করিয়া সেই শোণিত বিন্দুতে এই কয় লাইন লিখিয়াছে।"

ইয়াশিন সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"এ সাংঘাতিক পত্র কাশেমের নিজের শোণিতে লেখা! কি সর্ব্বনাশ!"

আগন্তুক বলিল—"সাহেব! এতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণই নাই। অভাব যেথানে অতি গুরুতর, আর প্রয়োজন তার চেয়েও জরুরী, সে ক্ষেত্রে লোকে সেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সবই করিতে পারে।"

ইয়াশিন একবার চকিত দৃষ্টিতে পত্রখানি পড়িয়া লইয়াছিল। তবুও সন্দেহ নিবারণের জন্য সে আবার তাহা পড়িল। সেই শোণিতে লিখিত, শোণিত-চিহ্নে চিহ্নিত, পত্রে লেখা ছিল—"আমি ইহাদের হাতে বন্দী। আমাদের দলের কে কোথায় তা জানি না। মুক্তির আশা খুব কম। এই আমার শেষ পত্র। খোদার দোহাই! গুল্‌কে একথা জানাইও না—তাহাকে আমার অবর্ত্তমানে দেখিও।—হতভাগ্য কাশেম।"

ইয়াশিন মুহূর্ত্ত মধ্যে ভাবিয়া লইল—এ ক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য। কাশেমকে যে উপায়ে হউক বাঁচাইতেই হইবে। তাতে সর্ব্বস্ব যায় যাক্।

সুতরাং সে সেই বেদুইন দস্যুকে বলিল—"আপনি এইখানে একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখনই আসিতেছি।"

সে অন্দর মহলে চলিয়া গেল। তাহার ক্ষুদ্র কোষাগারে যাহা কিছু নগদ ছিল, তাহা জড় করিয়া পাঁচ হাজারে দাঁড়াইল। সে জানিত, গুলের নিকট একটীও স্বর্ণ মুদ্রা নাই। কাশেম প্রদত্ত কয়েকখানি বহুমূল্য অলঙ্কার ভিন্ন, গুলের কাছে আর কিছুই নাই। আর তাহার নিজের নিকটও কাশেমের যে সমস্ত দামী জহরত ছিল—তাহা সে তাহার নিজের জহরত গুলির সহিত একত্র করিয়া নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিবার জন্য, কাশেমের বিদেশ

যাত্রার এক সপ্তাহ পরেই, এক গদীতে জমা রাখিয়া আসিয়াছে। আর এই গদীয়ানও নূতন রত্ন ক্রয়ের ও পুরাতনগুলি বিক্রয়ের জন্য, ইস্পাহানে চলিয়া গিয়াছে।

ইয়াশিন, পাঁচহাজার স্বর্ণমুদ্রা পূর্ণ থলিয়াটীর দিকে বার বার সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"খোদা দয়াময়! আমার এই পাঁচ হাজার মোহরকে কৃপাবলে দশ হাজার করিয়া দাও, প্রভু! তাহা হইলে আজ একটী বহুমূল্য জীবন রক্ষা হয়।"

নিজের প্রয়োজন বুঝিয়া মানুষ বিধাতার কাছে অনেক রকম প্রার্থনা করে। কিন্তু হায়! তার সকল প্রার্থনা কি পূর্ণ হয়? সুতরাং তাহার পাঁচ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা এই প্রার্থনায় দ্বিগুণ হইল না।

ইয়াশিন বাহিরের কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া, সেই আগন্তুককে বলিল—"আজ রাত্রে যদি আপনাকে পাঁচ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দিই, আর দুই চারি দিন পরে বাকী পাঁচ সহস্র দিই, তাহা হইলে আপনি আমার সোদরতুল্য কাশেমের জীবন রক্ষা করিতে সম্মত আছেন কি না?"

সেই মমতাহীন রুক্ষপ্রকৃতি বেদুইন বিদ্রুপপূর্ণ স্বরে কহিল—"না—তা কোনমতে সম্ভব নয়। আমরা যাহা বলি—তাহার একটী কথার নড়চড় হইলে, আমরা কাজ করিতে অরাজি ও অশক্ত।"

ইয়াশিন মহা বিপদে পড়িল। সেই বেদুইন দস্যুর মুখ দেখিয়া সে বুঝিল—কিছুতেই তাহাকে রাজি করান সম্ভব নয়।

বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, সেই বেদুইন দস্যু বলিল—"সাহেব! আর আমি দেরী করিতে পারি না। একে ত কাশেমের জীবন রক্ষা করা সহজ কাজ নয়। তাহার উপর আজকের রাতটী পোহাইলে, আরও অসম্ভব হইয়া

দাঁড়াইবে। এখনই আমায় সাত ক্রোশ পথ ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমি আর সময় নষ্ট করিতে পারি না।

মানুষ যখন খুব বিপদে পড়ে, আর নিজের বুদ্ধির সহায়তায় সেই মহা বিপদ হইতে মুক্ত হইবার কোন সম্ভাবনা দেখিতে না পায়, তখন সে ঈশ্বরের কৃপার উপর একান্তভাবে বিশ্বাস করে।

ইয়াশিন একবার মনে ভাবিল—"এই রাত্রে যদি গুল্‌কে জানাইয়া তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিয়া তাহার দুই একখানি জড়োয়া গহনাও সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইলে হয় ত কাশেমের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু সহসা কাশেমের পত্রের কথা মনে পড়ায় সে বুঝিল, সেরূপ করাতো কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। কাশেম গুল্‌কে যে এ সম্বন্ধে কোন কথাই জানাইতে নিষেধ করিয়াছে। আর জানাইলেও মহা অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। কেন না এ কথা শুনিলেই গুল্ ভয়ে অভিভূতা হইবে। কাঁদিয়া কাটিয়া আরও অনর্থ ঘটাইবে। হয় ত অনাগত বৈধব্যের আশঙ্কায়, আত্মহত্যা পর্য্যন্তও করিতে পারে। সকল দিকের পথই যে বন্ধ। মানুষের নিকট সাহায্য পাইবার কোন উপায়ই যে নাই। কাজেই তাহার সমস্ত বিশ্বাস সে সেই করুণাময় বিধাতার চরণতলে পৌঁছাইয়া দিয়া বলিল—"আমার সাধ্য যাহা, কাশেমের প্রাণরক্ষার জন্য তাহার ত্রুটি করি নাই। তুমি ত প্রভু সর্ব্বান্তর্য্যামী। এ জগতে আমার আর এই অভাগিনী গুলের, কাশেম বই আর আপনার বলিতে কেহই নাই। হে করুণাময়! তাহাকে রক্ষা করিও। তোমার ইচ্ছা হইলে কি না হয়, দীন্ দুনিয়ার মালিক?"

ইয়াশিন এইরূপ চিন্তায় মনে অনেকটা শান্তি ও সাহস পাইল। তবুও সে সেই নির্ম্মম বেদুইনের চিত্ত পরীক্ষার জন্য বলিল—"আমার সাধ্যায়ত্ত

যাহা, তাহা আমি করিতে প্রস্তুত। আপনি ত তাহাও দেখিলেন। আমার কাছে যাহা আছে, তাহা এখনই আপনাকে দিতেছি। এই পাঁচ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া যান। আর চার পাঁচ দিন পরে আসিবেন। বাকী পাঁচ হাজার মুদ্রা আপনাকে সেই দিনেই দিয়া দিব।"

বেদুইন দস্যু বলিল—"না—না—তা অসম্ভব! আমরা বিপন্নের টাকা খাইয়া তাহার সহিত নেমকহারামী করিতে শিখি নাই। এখনই যদি পুরা দাবীর টাকাটা পাইতাম, তাহা হইলে আর দুইজন কারারক্ষীকে বাঁটিয়া দিয়া কাশেমকে মুক্ত করা খুবই সম্ভব ছিল। দেখিতেছি, তাহাকে নিয়তিতে ধরিয়াছে। যাক্ আমি আর দেরী করিতে পারি না।"

বেদুইন দস্যু উঠিয়া দাঁড়াইল। ইরশান গভীর চিন্তার পর বলিল—"একটু অপেক্ষা করুন। এই পাঁচ হাজার স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে আর একটা কাজ করিতে পারিবেন কি?"

বেদুইন। বলুন—সম্ভব হয় করিব।

ইয়াশিন। এ দুনিয়ায় কাশেমের কাঁদিবার লোক আছে। আমার কেহই নাই। আমি অবিবাহিত। কাশেম আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। আপনি আমাকে কারাগারে রাখিয়া কাশেমকে ছাড়িয়া দিতে পারেন না কি? আমি আপনার সঙ্গে এখনই যাইতে প্রস্তুত।

বেদুইন একবার সবিস্ময়ে ইয়াশিনের মুখের দিকে চাহিয়া, মনে মনে বলিল—"হাঁ! মানুষের মত মানুষ এই লোক বটে। কাশেমের প্রকৃত বন্ধুই হইতেছে এই। কিন্তু এ যা করিতে বলিতেছে, তাহা অতি অসম্ভব।"

বেদুইনকে নিস্তব্ধ থাকিতে দেখিয়া ইরশান বলিল—"ভাবিতেছেন কি সাহেব? বৃথা সময় যাইতেছে। এর চেয়ে সহজ উপায় আর নাই।"

বেদুইন বলিল—“না সাহেব! এর চেয়ে জটিল পথ আর কিছুই নাই। আমাদের সর্দ্দারের দয়া হইলে কাশেম বরঞ্চ প্রাণে বাঁচিতে পারেন। কিন্তু জাল কয়েদী ধরা পড়িলে সর্দ্দার কেবল যে আপনাকে হত্যা করিবে, তাহা নহে—সেই সঙ্গে আমাকে ও আমার সঙ্গীদের ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবে। সর্দ্দার যদি কাশেমকে না দেখিত, তাহা হইলে এটা সম্ভব হইত। আর আমার সঙ্গীরাও এরূপ বিপদজনক কাজ করিতে রাজি হইবে না।”

ইয়াশিন কি ভাবিয়া বলিল—“যখন মানুষের দ্বারা কোন কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন আমি খোদার উপরই নির্ভর করিতেছি। কিন্তু আমার এখনকার যথাসর্ব্বস্ব, এই পঞ্চ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে, আমার আর একটী সামান্য অনুরোধ রক্ষা করিবেন কি?”

বেদুইন—ঠিক বুঝিতে পারিল না, এই সুচতুর ইয়াশিন আবার কি একটা অসম্ভব প্রস্তাব করিবে। কিন্তু তাহা হইলেও তাহার মনের কথাটা শোনায় দোষ নাই ভাবিয়া, সে বলিল—“ভাল! আপনার কথা আমি শুনিতে প্রস্তুত।”

ইয়াশিন। অই অঙ্গুরীয়টী কাশেমই আপনাকে দিয়াছে। অবশ্য কাশেমের এ দান—আমার নিকট তাহার বিপদের সংবাদ বহিয়া আনিয়াছেন বলিয়া। আপনি যে আংটীটি কাশেমের নিকট পাইয়াছেন, তাহাতে আপনার পূর্ণ অধিকার। ঐ আংটীটি আমায় বিক্রয় করুন। আমি ঐ আংটীটির পাঁচগুণ দাম আপনাকে দিতেছি।”

বেদুইন মনে মনে কি ভাবিয়া বলিল—“ভাল—তাহাতেই আমি প্রস্তুত। আপনি বোধ হয় এই আংটীটি আপনার বন্ধুর শেষ স্মৃতিচিহ্নরূপে রাখিতে চান? কেমন কিনা?”

ইয়াশিন। নিশ্চয়ই তাই!

বেদুইন তখনই সেই অঙ্গুরীটী ইয়াশিনের হাতে দিয়া বলিল—"আপনার প্রস্তাবে আমি স্বীকৃত। এখনই আমায় টাকার থলিয়াটী আনিয়া দিন।"

ইয়াশিন তখনই বাটীর ভিতর হইতে মোহরের তোড়াটী আনিয়া সেই দস্যুর সম্মুখে রাখিল। উভয়ের মধ্যে তখনই আদান-প্রদানের কাজ শেষ হইয়া গেল।

যাইবার সময় বেদুইন দস্যু বলিয়া গেল—"যদি কোন উপায়ে কাশেমের প্রাণটা আজ রাত্রের জন্য বাঁচিয়া যায়, তাহা হইলে আপনার প্রতিশ্রুত অই দশ সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে তাহার জীবন রক্ষার চেষ্টা করিব। আর তা যদি না হয়, তাহা হইলে আজ হইতে এক সপ্তাহের মধ্যে কাশেমের মৃত্যু সংবাদ, আপনার দ্বারে পৌছাইয়া দিতে ভুলিব না।"

আর কিছু না বলিয়া সেই ভীষণ দস্যু টাকার তোড়াটী লইয়া, তখনই ইয়াশিনের কক্ষ ত্যাগ করিল।

আর ইয়াশিন তাহার দিকে অনেকক্ষণ নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"হায়! যাহা এই মাত্র ঘটিয়া গেল—তাহা প্রত্যক্ষ কি স্বপ্ন? হায় কাশেম! আমার এ ছার জীবন দান করিলে তুমি যদি প্রাণে বাঁচিয়া যাও, তাহা করিতেও আমি প্রস্তুত।"

(৫)

পরদিন ইয়াশিন আর গুলের সহিত দেখা করিল না। সেই অদ্ভুত আগন্তুক চলিয়া যাইবার পর, দুশ্চিন্তায়, উৎকণ্ঠায়, সে সমস্ত রাত্রিটা জাগিয়াই কাটাইয়াছে। যে ঘটনায় তাহার হাত নাই, যাহার প্রতিকারে

তাহার কোন ক্ষমতা নাই, সেই চির প্রিয়তমের শোচনীয় মৃত্যুসম্ভাবনা জনিত একটা আকুলতা ও ভয়, প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাকে যেন অর্দ্ধমৃত অবস্থায় উপনীত করিতে লাগিল।

কেবলমাত্র বৃদ্ধা দাইয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া সে বলিল—"আমার নিজের একটু প্রয়োজনীয় কাজে বসোরা সহরের দিকে যাইতেছি। ফিরিতে বোধ হয় খুব রাত হইবে। সেই জন্য গুলের সঙ্গে আজ আর দেখা করিতে পারিলাম না। তাহাকে বলিও, সে যেন কিছু মনে না করে।"

এই প্রবীণা ও বর্ষীয়সী দাই আশীরা, সংসারের অনেক ব্যাপারই দেখিয়াছে। সে ইয়াশিনের মুখের দিকে চাহিবামাত্র দেখিল—এই কথাগুলা বলিবার সময় ইয়াশিনের কণ্ঠস্বর যেন একটু গম্ভীর। আর তাহার চোখ যেন বসিয়া গিয়াছে। খুব একটা দুশ্চিন্তা মানুষের মনকে জোরে চাপিয়া ধরিলে, মুখের যেমন ভাব হয়, ইয়াশিনের মুখের ভাব ঠিক সেইরূপ।

সন্দেহভঞ্জনের জন্য দাই বলিল—"সাহেব! আপনার মুখ অত মলিন কেন? কাল রাত্রে কি আপনার ভালরূপ নিদ্রা হয় নাই?"

ইয়াশিন শুষ্ক হাস্যের সহিত বলিল—"কতকটা তাই বটে। তারপর এক জায়গায় আমার কিছু টাকা জমা ছিল। সেটা মারা যাইবার মত দশায় পড়িয়াছে—তার উপর কাশেমের চিঠিপত্র নাই—এই সব নানা দুর্ভাবনা! এতেই তবিয়ৎটা বড়ই বেতমিজ্ হইয়াছে।"

দাই একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"খোদা আপনাকে সুস্থ রাখুন। কাশেম সাহেব এখানে নাই, তার উপর আপনি বিছানায় পড়িলে আমাদেরই মহা বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে।"

বেশী কথা কহিতে গেলে ধরা পড়িতে হয় দেখিয়া, ইয়াশিন সে স্থান

ত্যাগ করিল। কাজ তাহার ছাই আর পাঁশ। গত রাত্রের সেই অদ্ভুত ব্যাপারের পর তাহার বড়ই একটা চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল। সে ঘরে টিকিতে পারিতেছিল না। ভাবিতেছিল, বাহিরের কোন সরাইখানায় থাকিয়া দিনটা কাটাইয়া দিবে। কিন্তু তাহা করিল না।

সে নিজের কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে দ্বার ভেজাইয়া দিল। ভৃত্যকে বলিল "যদি কোন লোকজন আমাকে খুঁজিতে আসে—বলিস্ তিনি এখানে নাই। দুই চারি দিন বাড়ীতে আসিবেন না।"

আকাশের দিকে চাহিয়া সে দেখিল—উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে বিশ্ব-প্রকৃতি জ্বলিতেছে। সহরের মিনারওয়ালা বাড়ীগুলির চূড়ার উপর স্বর্ণবর্ণ সূর্য্য-কিরণ পড়িয়া তাহা চকমক্ করিতেছে। পথিপার্শ্বের গাছগুলির শাখা সমূহ চঞ্চলভাবে ধীর সমীরে দুলিতেছে। রাস্তায় কত রকমের লোক চলিতেছে, ফিরিতেছে, আসিতেছে, যাইতেছে, কোন দিকেই ইয়াশিনের বিশেষ লক্ষ্য নাই।

সে মনে মনে ভাবিতেছে—এইত দিবার প্রথম যাম উত্তীর্ণ হইয়া গেল। সেই বেদুইন, এর কত আগে তাহার আড্ডায় পৌঁছিয়াছে! যদি ঠিক সময়ে পৌঁছিতে না পারে, সে হয়ত গিয়া দেখিবে—দস্যুপতির নিষ্ঠুর আদেশে, কাশেমের মস্তক তাহার স্কন্ধচ্যুত হইয়াছে! একথা কল্পনাতেও ভাবিতে, ইয়াশিনের প্রাণে একটা ভীষণ কম্পন উপস্থিত হইল।

তারপর সে ভাবিল—"সেই দস্যু বলিয়াছে, ঠিক সাত দিনের দিন, সে আসিয়া সংবাদ দিয়া যাইবে, যে কাশেম জীবিত আছে কি না? বাজে কথা! কাশেম যদি সত্য সত্যই জীবিত থাকিত— তাহা হইলে এই বেদুইন আরও আগে তাহার সংবাদ দিবার জন্য ব্যবস্থা করিত। কিছুই নয় সে

উপর চাল চালিয়া আমার নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকা আংটিটীর বদলে আদায় করিয়া লইয়া গেল। আরও কিছু লইবার ইচ্ছা ছিল, তাহা পারিল না।"

ইয়াশিন বাতায়নপথ ত্যাগ করিয়া এক ক্ষুদ্র পেটিকা মধ্য হইতে, গতরাত্রের বেদুইন প্রদত্ত সেই অঙ্গুরীয় ও শোণিতমাখা চিঠিখানি বাহির করিল। চারিদিকে সভীত নেত্রে চাহিয়া দেখিয়া, উজ্জ্বল দিবালোকে সেই স্বর্ণময় অঙ্গুরীয়টী উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিল। সে অঙ্গুরীয়তো জাল নয়—কাশেমেরই অঙ্গুরীয় বটে! সেই আংটিটীর ভিতরের দিকে আরবী ভাষায় উজ্জ্বল অক্ষরে খোদিত রহিয়াছে "গুল্-কাশেম।" গুলের নাম তাহার নামের সাহিত চিরবিজড়িত করিবার জন্য, কাশেম যে তাহারই হাত দিয়া বসোরার এক শ্রেষ্ঠ মণিকারের নিকট হইতে এই অঙ্গুরীয় প্রস্তুত করাইয়াছিল। সুতরাং এ অঙ্গুরী সম্বন্ধে ত তাহার কোনরূপ ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। সে তাহা দেখিবামাত্রই চিনিল।

তারপর সে সভয়ে, শঙ্কিতচিতে, কম্পিতপ্রাণে, কাশেমের লিখিত সেই ক্ষুদ্র পত্রখানি বাহির করিয়া পড়িল। পূর্ব্ব রজনীতে সে যাহা পড়িয়াছিল, এখনও পড়িল তাই। আর প্রস্ফুট দিবালোকে ইহাও দেখিল, সে পত্রও যে শোণিত দিয়া লেখা, তাহারও কোন সন্দেহ নাই।

সে মনে মনে বলিয়া উঠিল—"হায়! সত্য সত্যই যদি কাশেমের হত্যাকাণ্ড সত্য হয়, তাহা হইলে এই অভাগিনী গুলের উপায় কি হইবে?"

এ প্রশ্নের সে কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। তবে এইটুকু বুঝিল—এই গুল্‌নেয়ার কাশেমকে যেরূপ ভালবাসে, তাহার শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ শুনিলে, অভাগিনী নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিবে।

"ওঃ—আর ভাবিতে পারি না।" বলিয়া ইয়াশিন সভয়ে একবার তাহার কক্ষের চারিদিকে চাহিল। তাহার মনে সন্দেহ হইল—হয়ত আড়াল হইতে কেহ যেন তাহার অন্তরের কথাগুলি শুনিয়া ফেলিয়াছে।

অতি সন্তর্পণে কক্ষদ্বার খুলিয়া, দালানের চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া সে বুঝিল, কেহ তাহার কথা শোনে নাই। কেহই সেখানে নাই। তাহার খাস্ গোলাম, নিত্য প্রথামত নীচের তলায় বসিয়া সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতেছে। ইয়াশিন তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

তারপর সে পোষাক পরিধান করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। ভৃত্যকে বলিয়া গেল—"ঘণ্টাকয়েকের মধ্যেই আমি ফিরিয়া আসিতেছি। আমার নামে যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি কোন পত্র আনে—তাহা নিজে রাখিয়া দিবি। অর্থাৎ সেই লোকটা—যে কাল গভীর রাত্রে আমার কাছে আসিয়াছিল। খুব সম্ভবতঃ সেই নিজে আসিয়া পত্রখানি তোর হাতে দিবে।"

গোলাম বলিল—"যো হুকুম খোদাবন্দ!" ইয়াশিন বাটীর বাহির হইয়া গেল। আর সেই গোলামটা যে অতীত রাত্রে, এক ভীষণকায় আগন্তুককে তাহার প্রভুর সঙ্গে দেখিয়াছিল—সে অতি সহজেই বুঝিল—"ব্যাপারটা খুব গুরুতর না হইয়া যায় না। সেই লোকটা যে বেদুইন ডাকাত, তা তার চেহারাতেই আমি বুঝিয়াছি। সে যে খুব একটা সঙ্গীন কাজ লইয়া আমার মনিবের কাছে আসিয়াছিল, সেপক্ষে আর কোন সন্দেহ নাই। দ্বারের আড়ালে অতি প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া, আমি যেন কাশেম সাহেবের নামটা অস্পষ্টভাবে শুনিয়াছিলাম। যাক্—বড় লোকের বড় কথায় আমার কাজ কি? মনিব বড় রাগী। মুখ বুজিয়া থাকিতে বলিতেছেন তাই থাকি।"

সেইদিন গভীর রাত্রে ইয়াশিন তাহার বাটীতে অতি গোপনে ফিরিয়া আসিয়া, নিজের কক্ষে প্রবেশান্তে দরোজাটী নিঃশব্দে ভেজাইয়া দিল। সে নগরের বাহিরে কোন মরুপথগামী ব্যবসায়ীর নিকট, কাশেমের সংবাদ আনিতে গিয়াছিল। এই লোকটী একজন আরব-দেশীয় ব্যবসায়ী। কাশেমের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। সম্প্রতি সে দামাস্কস্ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার নিকট হইতে ইয়াশিন এই সংবাদটুকু পাইল "বসোরার সুলতানের দল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দামাস্কসের পথে যাইতেছিল। এমন সময়ে ভীষণ মরু-ডাকাত মীরহবীবের দুৰ্দ্ধর্ষ সেনারা তাহাদের মধ্যে পড়িয়া দুইদলকে বিভক্ত করিয়া দেয়—আর এই দস্যুদের আর একদল পিছন হইতে তাহাদের আক্রমণ করে। মোটের উপর দলের অর্দ্ধেক লোক নিহত হয় আর বাকী যাহারা তাহারা ডাকাতের হস্তে বন্দী হইয়া পড়ে। এই বন্দীদের মধ্যে সম্ভবতঃ আমাদের কাশেমও একজন। আমাদের সুলতানের কাছে কেহই সাহস করিয়া একথা জানাইতে পারিতেছে না। কারণ যে এ সংবাদ দিতে তাঁহার কাছে যাইবে, তাহারই জান্ যাইবে। কম নয় ত লাখ্ টাকার জহরতই তাহাদের সঙ্গে ছিল—আরও পঞ্চাশ হাজার টাকার অন্যান্য উপঢৌকন। দেড় দেড় লাখ টাকা খেসারত! সহজ কথা ত নয়।"

তবুও ইহা অনিশ্চিত সংবাদ। ইয়াশিন যে সকল স্থান হইতে সংবাদ পাইতেছে, সবই এইরূপ সন্দেহের ছায়ার আবরণে ঢাকা। সুতরাং সে বড়ই বিপদে পড়িল।

কাশেম যে দস্যু হস্তে বন্দী, এ সংবাদেও তাহার বিশ্বাস নাই। হইতে পারে এ সংবাদ মিথ্যা। কিন্তু যদিও সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে সে কারাগার হইতে পলাইতে পারিল কি না—অথবা দস্যু সর্দ্দারের

আদেশে শোচনীয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল,—তাহার কোন সঠিক সংবাদ ত সে পাইতেছে না।

দিন রাত কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। ইয়াশিনের দিনগুলিও দুঃখের চিন্তায়, আর দুর্ভাবনায় কাটিতে লাগিল।

দিবাকর নিত্যই আকাশ দ্যুতিময় করিয়া উঠেন, আবার দিনান্তে অস্ত যান। দিবা ও রজনীর এই নিত্য আবর্ত্তনের সঙ্গে, ইয়াশিনের দুঃখের দিনগুলি কাটিতে লাগিল।

সে গুল্‌নেয়ারের সঙ্গে আজকাল আর ঘন ঘন দেখা করে না। যখন তাহার সম্মুখে যায়, তখন প্রাণটার মধ্যে খুব একটা সংযমের শক্তি আনিয়া, তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহে। এজন্য গুল্—তাহার বিশেষ কোন ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিবার অবসর পায় না।

কিন্তু এরূপ ভাবে, কয়দিনই বা কাটান যায়? একটা না একটা নূতন আশাজনক সংবাদ, গুল্‌কে না দিতে পারিলে—সে বড়ই অধৈর্য্য হইয়া উঠিবে।

সে আর কোন উপায় না পাইয়া এজন্য একদিন গুল্‌কে জানাইল, যে কাশেমের দামাস্কস্ পৌছান সংবাদ সুলতানের কাছে আসিয়াছে। সংবাদটী অতি গোপনীয়। সে সুলতানের একজন উজীরের নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়াছে। আর সে এই সঙ্গে কাশেমের পরিচিত একজন বড় উজীরের নামও উল্লেখ করিতে ভুলিল না। কাজেই গুল্ তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া, অনেকটা শান্তভাব ধারণ করিল।

দেখিতে দেখিতে ছয় দিন কাটিয়া গেল। সাত দিন। এই সাত দিনের দিন সেই বেদুইন কাশেমের সংবাদ দিবে বলিয়া গিয়াছে। বেদুইন

আরব দস্যু হউক আর যাহাই হউক, তাহারা যাহা প্রতিজ্ঞা করে, তাহা ভঙ্গ করে না। এই আশাতেই ইয়াশিন বুক বাঁধিয়াছে।

আর এই ভাবের মরীচিকাময় আশার ছলনা, সে যে আরও ভয়ানক। আশা তাঁহার কাণে কাণে বলিতেছে—"ভয় কি? কাশেম নিরাপদেই আছে। সেই বেদুইন দস্যুই ভবিষ্যতের একটা মোটা টাকার লোভে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিবে।"

আশার ছলনায় ইয়াশিন দিন কাটাইতে লাগিল। এই কাশেম যে তাহার সব! স্নেহ ও মমতায়, উদারতায়, ক্ষমায়, এই দেবতুল্য কাশেম যে তাহাকে গোলামের গোলাম করিয়া রাখিয়াছে। জীবনে ত কাশেম কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা করে নাই। তবে তাহার অনিষ্ট হইবে কেন?

কিন্তু মুক্তি পাইলেই কি কাশেম সরাসর বসোরায় আসিতে সাহস করিবে? না—সেটা বোধ হয় অসম্ভব। সুলতানের কোপমুখ হইতে আত্মরক্ষার জন্য নিশ্চয়ই তাঁহাকে আত্মগোপন করিতে হইবে। হোক্—তবু ত তাঁর বহুমূল্য প্রাণটা বাঁচিবে। তারপর আমরা না হয় সকলে এই বসোরা ত্যাগ করিয়া আর কোথাও চলিয়া যাইব।

(৬)

পরদিন প্রভাতে ইয়াশিনের বিশ্বাসী ভৃত্য তাহাদের সদর দরোজা খুলিবামাত্রই, একখানি লোহিতবর্ণের মোড়ক করা কাগজ দেখিতে পাইল। নিরক্ষর সে—কাজেই সে সেই কাগজখানি তাহার প্রভুর সম্মুখে আনিয়া ধরিল।

ইয়াশিন দেখিল—"সেই লাল পত্রখানির উপর কৃষ্ণবর্ণের একটী

ছোরা আঁকা রহিয়াছে। ব্যাপার যে কি, তাহা বুঝিতে তাহার দেরী হইল না। সে ভৃত্যকে কফি আনিতে আদেশ করিয়া, নিবিষ্টচিত্তে সাগ্রহে সেই পত্রখানি পড়িল।

পত্রখানি বড় নয়। দুই চারি লাইনেই শেষ হইয়াছে। তাহাতে লেখা আছে—"সাহেব! বেদুইন আরব, দস্যুই হউক আর যাহাই হউক সে কখনও তাহার কথার খেলাপ করে না। কাশেমের সংবাদ দিবার জন্য আমি আপনার কাছে প্রতিশ্রুতি করিয়া আসিয়াছিলাম। তাই আজ সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতেছি। আমি সেইদিন প্রভাতপূর্ব্বে যথা সময়েই শিবিরে ফিরিয়া আসি। কিন্তু সেইদিন হইতে কাশেমের কোন সংবাদই পাই নাই। শুনিলাম, আমাদের সর্দ্দারের মনে সন্দেহ হওয়ায়, সে কাশেমকে খুব গোপনীয় কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে। আমার বোধ হয় এটা জনরব। কেন না তারপর আমি গুপ্ত অনুসন্ধানে জানিয়াছি, কাশেমকে খুব সম্ভবতঃ হত্যা করা হইয়াছে। আমার এই পত্রখানি পাঠান্তে আগুনে পোড়াইয়া ফেলিবেন।"

পত্রখানি পড়িবামাত্রই ইয়াশিনের মুখ শবের মত মলিন হইয়া গেল। তাহার বুকের ভিতর একটা যন্ত্রণা উপস্থিত হইল—চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। সে মনে মনে ভাবিল, কাশেম নিশ্চয়ই মরিয়াছে। কেননা কাশেমকে মুক্তি দিতে পারিলে সে এই বেদুইনকে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পর্য্যন্ত পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিল। কাশেমের মুক্তির জন্য এত টাকার লোভ সে যে সহজে ত্যাগ করিবে তাহাও অসম্ভব! যাহা বিধিলিপি, যাহা ভবিতব্য, তাহাই ঘটিয়া গিয়াছে! কাশেম নিশ্চয়ই ইহলোকে নাই।

ভৃত্য কখন যে তাহার কফি রাখিয়া গিয়াছে, ইয়াশিন তাহা জানিতে

পারে নাই। যখন তাহার চমক ভাঙ্গিল, সে অগত্যা সেই ঠাণ্ডা কফিটুকু খাইয়া লইল। আবার সেই পত্রখানি পড়িল। তাহার চোখে পুনরায় অশ্রুধারা দেখা দিল।

তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া, সে অস্ফুটস্বরে বলিল—"তাহা হইলে এই অভাগিনী গুলের দশা কি হইবে? কে তাহাকে এ ভীষণ সংবাদ জানাইতে সাহস করিবে? সে দিন দিন যেরূপ অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছে, তাহাকে আর শান্ত রাখাও যে দুষ্কর। হায়—হতভাগ্য গুল্! হায় হতভাগ্য কাশেম! শেষ কি আমার উপরই এই সাংঘাতিক কার্য্যভার পড়িল!"

"যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা আসিয়া দেখা দেয়।" এরূপ একটা প্রবাদ সকল দেশেই আছে। ইয়াশিন যখন মনে মনে ভাবিতেছে কি করিয়া গুল্‌কে এ সংবাদ দেওয়া যায়, সে যখন এই সাংঘাতিক ব্যাপারের একটা সমস্যার চিন্তায় ব্যস্ত, তখনই দাই আসিয়া বলিল "ইয়াশিন সাহেব! আমার বিবি আপনাকে সেলাম দিয়াছেন। তলব বড়ই জরুরি।"

ইয়াশিন তখনই যথাসাধ্য মনোভাব গোপন করিয়া, সহজভাবে বলিল—"গুল্‌কে বল গিয়া আমি এখনই যাইতেছি।"

কক্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ইয়াশিন মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এ সংবাদ চাপিয়া রাখা ত সম্ভব নয়। মানুষের মন যে অন্তর্য্যামী। মন যে ভালমন্দ সব কথাই জানিতে পারে। বিশেষতঃ যে যাহাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ভাল বাসিয়াছে—সে তাহার প্রিয়তমের কোন অনিষ্ট ঘটিলে তাহা যেন মনঃশ্চক্ষে আগেই দেখিতে পায়! গুলের মত পতি-প্রেমানুরক্তা রমণীকে মিথ্যা কথা বলিয়া প্রতারিত করা, খুবই একটা শক্ত কাজ। অতি হীন পাপের কাজ।

সে তখন ত্বরিতপদে সেই অঙ্গুরীয়টী আর সেই ছবিখানি, টান্নার মধ্য হইতে সংকুচিতভাবে বাহির করিয়া, তাহার বক্ষ বসনের মধ্যে লুকাইল। তারপর চেষ্টা করিয়া মনের মধ্যে একটা দৃঢ়তা আনিয়া, মুখে একটা প্রসন্ন ভাব ফুটাইয়া তুলিয়া, গুলের কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া ডাকিল—"গুল্!"

গুল্ ভিতর হইতে বলিল—"এস এস ইয়াশিন! দ্বার খোলা আছে।"

ইয়াশিন কম্পিত হৃদয়ে গুলের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। অপেক্ষাকৃত প্রসন্নমুখে বলিল—"তুমি কি আমায় ডাকিয়াছিলে গুল্‌নেয়ার?"

গুল্ একবার ইয়াশিনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"ঐখানে বসো। তোমার দাদার কোন সংবাদ পাইলে কি?"

"না—কোন সংবাদই তাঁর নাই।"

"আর যাঁরা তাঁর সহযাত্রী ছিলেন—তাঁহাদের বাড়ীতে কি কোন সংবাদের জন্য অনুসন্ধান করিয়াছিলে?"

"তাহা করিতে বাকী রাখিয়াছি কি গুল্‌নেয়ার?"

"তাঁহাদের বাড়ীতেও কোন সংবাদ আসে নাই?"

"না—"

"তাহা হইলে কি আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে?"

"ছিঃ! ও কথা বলিতে নাই। খোদা তোমার মঙ্গল করুন! কাশেমকে দীর্ঘজীবি করুন।"

গুল্ কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল—"তুমি কি স্বপ্নে বিশ্বাস কর, ইয়াশিন?"

ইয়াশিন বলিল—"স্বপ্ন! সেত চিরদিনই মিথ্যা। স্বপ্নের মায়ায়, রাত্রে

কেউ রাজা হয়, কেউ পথের ভিখারী হয়। আবার সকালে সে যে অবস্থার লোক—তাই থাকে। স্বপ্ন আমি বিশ্বাস করি না।”

“আমি করি। যেখানে প্রাণের আকর্ষণ অতি প্রবল—একেবারে দুশ্ছেদ্য—সেখানে স্বপ্ন অনেক সময় আভাসে ইঙ্গিতে, সত্য কথা বলিয়া দেয়। বিশেষতঃ—মৃত্যুর স্বপ্ন!”

“তুমি স্বপ্নে কি দেখিয়াছ গুল্?”

“দেখিলাম—কাশেম দস্যু হস্তে বন্দী। দস্যুরা তাহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া এক নির্জ্জন প্রান্তর মধ্যে তাহাকে হত্যা করিতেছে।”

ইয়াশিন এ কথা শুনিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। স্বপ্নও কি তাহা হইলে সত্য হয়? কাশেমের সম্বন্ধে গুল্ যে স্বপ্ন দেখিয়াছে; তাহা হয় তো ঠিক! কাশেমের মৃত্যুর সাক্ষাৎ প্রমাণ যে তাহার বক্ষ বসনের মধ্যে।

ইয়াশিনের মুখভাব সহসা পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া, গুল্‌নেয়ার একটু বিস্মিত হইল। তাহার মনে সন্দেহের একটা ছায়া দেখা দিল। সে বলিল—“ইয়াশিন! কাশেম তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের তুল্য। আমি সেই কাশেমের আদরিণী পত্নী। আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, একটা সত্য কথা বলিবে কি?”

“বল—কি জানিতে চাও?”

“আমার মনে কেমন একটা ধারণা জন্মিয়াছে, তুমি যেন আমার কাছে, কোন কিছু গোপন করিতেছ। আমার বিশ্বাস, তুমি কাশেমের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন অশুভ সংবাদ পাইয়াছ কিন্তু আমায় তাহা বলিতেছ না। দেখিতেছি আজকাল বড় একটা আমার কাছে আসিতে তুমি সাহস কর না, তোমার মুখে কে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে। খোদার দোহাই! সত্য কথা

বল! বিপদ—মহা বিপদ আমার সম্মুখে! আমার যে সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তাহা আমার মনই আমাকে বলিয়া দিতেছে। তুমি গোপন করিলেও আমি জানিতেছি, কাশেম আর ইহলোকে নাই—"

গুল্ আর বলিতে পারিল না। সে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার নেত্র-নির্গত, গণ্ডবাহী অশ্রুধারা, ইয়াশিনের বুকে শেলাঘাত করিল। সে চিরদিন গুলের সুখের দিনই দেখিয়া আসিয়াছে। তাহাকে কখনও কাঁদিতে দেখে নাই। কিন্তু হায়! সেই সদাপ্রফুল্ল, সরস বাসন্তীকুসুমের মত মধুর লাবণ্যময়ী, গুল্ যে দুর্ভাবনায় দিনে দিনে শুখাইয়া যাইতেছে। তাহার প্রাণে সন্দেহের যে মহা ঝড় বহিতেছে,তাহা তাহার হৃদয়-তন্ত্রীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে। তাহার আহারে রুচি নাই,বেশবিন্যাসে প্রবৃত্তি নাই,সঙ্গীতে আসক্তি নাই—নিদ্রায় শান্তি নাই। পলে পলে, এরূপ যন্ত্রণার নিষ্ঠুর নিপীড়ন সহ্য করার অপেক্ষা, ভীষণ সত্য যাহা তাহার যবনিকা উত্তোলিত হওয়ায় শ্রেয়ঃ।

এইভাবে চিন্তার পর, ইয়াশিন বিশুষ্ক মুখে কম্পিত স্বরে বলিল—"গুল্‌নেয়ার! আমি তোমায় কনিষ্ঠা ভগ্নীর মত স্নেহ করিয়া আসিয়াছি। কাশেম যাইবার সময় বার বার আমাকে বলিয়া গিয়াছিল—গুল্‌কে দেখিও। সে পক্ষে কোন ত্রুটিই আমি করি নাই তোমার নিকট সত্য গোপন করিব না। এ পর্য্যন্ত আমি তোমায় কেবল স্তোকবাক্যে প্রতারিত করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু সত্য বলিতে কি গুল্! কাশেমের কোন সংবাদই আমি পাই। তবে সংবাদরূপে যাহা পাইয়াছি তাহা অতি ভীষণ! অতি সাংঘাতিক! তাহার সুতীব্র আঘাত সহ্য করা তোমার মত কোমল হৃদয়া রমণীর পক্ষে কতটা সম্ভব, তাহা ত আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না? অথচ সে সংবাদ মিথ্যা বলিয়াই আমার মনের ধারণা।

গুল্ সবিস্ময়ে ইয়াশিনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"তাহা হইলে গত রাত্রের স্বপ্ন আমাকে ইঙ্গিতে যাহা দেখাইয়া গিয়াছে, তাই কি ঠিক্ ?"

ইয়াশিন বলিল—"ইহার অপেক্ষা সাংঘাতিক প্রমাণ আমার কাছে আছে। কিন্তু সে প্রমাণ আমার চোখে বড়ই সন্দেহজনক। আমি, আশা করি, সে প্রমাণ তোমার হস্তগত হইলে তুমিও আমার সহিত একমত হইবে।"

"দেখি তোমার কাছে কি প্রমাণ আছে ?" বলিয়া গুল্ পাষাণে প্রাণ বাধিয়া, তাহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া দিল—আর ইয়াশিন কম্পিত হৃদয়ে, সেই অঙ্গুরীয় ও শোণিতসিক্ত পত্রখানি গুলের হাতে দিল !

অঙ্গুরীয়টী দেখিবামাত্রই গুল বুঝিল, তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এ যে কাশেমের অঙ্গুরীয় ! কাশেম যে তাহাকে এইরূপ আর একটী অঙ্গুরীয় পরিতে দিয়াছিল। সে অঙ্গুরীয় তখনও যে তাহার অঙ্গুলিতে বিদ্যমান।

গুল্ অঙ্গুলী হইতে তাহার আংটীটি খুলিয়া লইয়া ইয়াশিন প্রদত্ত অঙ্গুরীয়ের সহিত মিলাইয়া বুঝিল—সত্যই তাহা কাশেমের অঙ্গুরীয়। এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। কোন ভ্রমই নাই। বসোরার যে কারিকরগণ এই দুটী আংটী প্রস্তুত করিয়াছিল, অঙ্গুরীয়ের ভিতরের দিকে তাহাদের দুইজনের নাম খোদিত। দুইটীর পিছনে একই অক্ষরে লেখা "গুল্-কাশেম।"

সত্যই কাশেম, তাহাদের শুভ মিলনের পর, এইরূপ এক ধরণের দুইটী অঙ্গুরীয় তৈয়ারি করাইয়াছিল। দুইটীই দেখিতে একরূপ। দুইটীর উপরেই "গুল্—কাশেম" নাম খোদিত। তাহাদের নবসূচিত দাম্পত্য জীবনের প্রেমোপহার রূপে, গুলের অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়কটী পরাইয়া দিবার সময়

কাশেম বলিয়াছিল—"জানিও গুল্! তোমার নামাঙ্কিত এই অঙ্গুরী, আমার জীবন থাকিতে, কখনই আমার অঙ্গুলিচ্যুত হইবে না। তুমিও ইহা ত্যাগ করিও না।"

গুল্ অনেকক্ষণ ধরিয়া অঙ্গুরীয়কটী লইয়া নাড়া চাড়া করিয়া বুঝিল, সত্যই তাহা কাশেমের। সে বিস্মিত মুখে অশ্রুপূর্ণনেত্রে ইয়াশিনকে বলিল—"এ অঙ্গুরীয় তোমার কাছে আসিল কিরূপে?"

ইয়াশিন তখন সেই স্মরণীয় রাত্রের, গভীর নিশীথের, সমস্ত ঘটনা, গুল্‌কে খুলিয়া বলিল। গুল্ অতিকষ্টে কাশেমের স্বহস্ত লিখিত পত্রখানি পাঠ করিল। পত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঝটিকাপীড়িত বল্লরীর মত ভীষণ ভাবে কাঁপিয়া উঠিল। সে তখনই মূর্চ্ছিতা হইল।

বিপদের উপর বিপদ! ইয়াশিন তখনই "সর্ব্বনাশ হইল—" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

সেই চীৎকারে দাই আসীরা ও একজন বাঁদী ছুটিয়া আসিল। ইয়াশিন দাইকে দুই চারি কথায় সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া দিয়া, সকলে ধরাধরি করিয়া গুল্‌কে তাহার শয্যার উপর শোয়াইল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরিচর্য্যার পর শ্বাস-প্রশ্বাসের বেগ স্বাভাবিক হইলেও পূর্ণ চেতনার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

ইয়াশিন সভয়চিত্তে দাইকে বলিল—"তোমরা কেহই এস্থান ত্যাগ করিও না। এই ভাবেই শুশ্রূষা এখন চলুক। আমি শীঘ্রই আমাদের হাকিমকে ডাকিয়া আনিতেছি।"

শুশ্রূষা পূর্ব্ববৎ চলিল। স্নিগ্ধ গুলাববারি মুখে চোখে দেওয়ায়, মুখের অবস্থা স্বাভাবিক হইল বটে, কিন্তু ডাকিলে উত্তর নাই—দেহে স্পন্দন নাই, নেত্রদ্বয় নিমীলিত।

দাই দুই তিন বার গুলের বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল—"গুল্! ওমা! গুল্!"

কেই বা এই কাতর আহ্বানের উত্তর দিবে। দাই গুলের অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময়ে ইয়াশিন হকিম লইয়া সেই কক্ষে উপনীত হইল। হকিম রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন—"চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চেতনা হইতে পারে। কোন ভয়ের কারণ নাই। খুব সম্ভবতঃ পড়িয়া যাওয়ায় মস্তিষ্কে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। চেতনা লাভের সঙ্গে সঙ্গে একটা জ্বর আসা সম্ভব। যদি তা না আসে, তবে শুভ চিহ্ন। কিন্তু জ্বর দেখা দিলে খুবই বিপদের সম্ভাবনা।"

হকিম সাহেব সেই বসোরা সহরের মধ্যে একজন গণনীয় চিকিৎসক। স্বয়ং সুলতানের চিকিৎসা পর্য্যন্ত তিনি করেন। ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া, ঔষধ নিজের হাতে খাওয়াইয়া দিয়া, হকিম সাহেব ইয়াশিনকে বলিলেন—"একে দারুণ মর্ম্মবেদনা, তার উপর মস্তিষ্কে আঘাত। অবস্থা যে সহজ তাহা নয়। তবে সবই খোদার মর্জি। রোগীর শুশ্রূষাটা, আপনার মত একজন সাহসী ও স্থিরচিত্ত লোকের দ্বারা হইলেই ভাল হয়।"

ইয়াশিন তাহাতেই স্বীকৃত হইল। হকিম চলিয়া গেলে, সে দাইকে একটু আড়ালে লইয়া গিয়া কাশেম সম্বন্ধে সমস্ত কথাই খুলিয়া বলিল। দাই চোখে কাপড় দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। হায়! সে যে এই মাতৃহীন কাশেমকে বাল্যকাল হইতে মানুষ করিয়াছে।

ইয়াশিন তাহাকে দুই চারি কথায় সান্ত্বনা করিয়া বলিল—"এ সংসারে গুলের আপনার বলিতে আর কেহ নাই। আছ—কেবল তুমি। যাহা

হইবার তাহা ত হইয়াছে। কাঁদিলে ত কাশেমকে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। এর পর যত পার কাঁদিও। এখন তুমি যদি সাহস হারাও, এরূপ ব্যাকুল হও, তাহা হইলে কাশেম ত চলিয়া গিয়াছে—গুল্‌ও তাহার সঙ্গে কবরে যাইবে। শুনিলে ত হকিম সাহেব কি বলিয়া গেলেন।"

দাই কি করিবে, উপায়ান্তর না দেখিয়া গুল্‌কে বাঁচাইবার জন্ম সাহসে বুক বাঁধিল।

সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিয়া ইয়াশিন গুলের সেবা-শুশ্রূষা করিল। যখন যে ঔষধটী দেওয়া দরকার, ঠিক সেইরূপই করিতে লাগিল। আর তাহার অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলও ফলিল।

শেষ রাত্রে গুলের চেতনা হইল। কক্ষমধ্যে আলোক জ্বলিতেছে। ইয়াশিন সবিস্ময়ে দেখিল, গুল্ চক্ষু মেলিয়া উদাস দৃষ্টিতে কক্ষের চারিদিক দেখিতেছে।

সে তাহার শিয়রের দিকে বসিয়াছিল। দাই, সারা রাত জাগিয়া ক্লান্ত হইয়া একটু ঘুমাইয়াছে। চারিদিকে উদাসদৃষ্টিতে চাহিয়া গুল্ অতি ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করিল—"আমি কোথায়?"

ইয়াশিন বলিল—"তুমি তোমার কক্ষে। তোমার নিজের শয্যায়।"

গুল্। কাশেম কি ফিরিয়া আসিয়াছে?

ইয়াশিন এ কথার কোন উত্তর দিল না। তাহার ভয়, পাছে আবার তাহার মূর্চ্ছা হয়।

ইয়াশিনকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া গুল্ আবার বলিল—"তুমি কে?"

ইয়াশিন। আমি ইয়াশিন।

গুল্। তুমি এখানে কেন?

ইয়াশিন। তুমি মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলে। আমি হকিমের আদেশে তোমার শুশ্রূষা করিতেছি।

গুল্। তাহা হইলে কাশেম এখনও আসে নাই?

ইয়াশিন। না—

গুল্ আর কিছু বলিল না। আবার চক্ষু মুদিল। তার পর বহুক্ষণ ধরিয়া আর সে কোন কথা কহিল না।

সেই ঘটনাময় রজনীর অবসানে, তাহার জ্বর আসিল। প্রভাতের পর সেই জ্বর প্রলাপপূর্ণ হইল। প্রলাপ বাক্যের মধ্যে কেবল "কশেম! তুমি আসিলে না! এত ডাকিতেছি, তবুও না? বড়ই নিষ্ঠুর তুমি!"

হকিম যাহা অনুমান করিয়া গিয়াছিলেন, শেষ তাহাই ঘটিল। ইয়াশিন প্রাণের দায়ে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া গুলের শুশ্রূষা করিয়াছে। তাহার মুখ শুষ্ক—নেত্র কোটরমগ্ন বদনমণ্ডলে একটা দারুণ দুশ্চিন্তার ছায়া। এই অবস্থাতেই সে সেই জ্বালাময় প্রভাতে হকিমের বাড়ীর দিকে ছুটিল।

হকিম্ আসিয়া আবার নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। যাইবার সময় বলিলেন—"এই জ্বরটা ছাড়িবার সময় একটা খুব সঙ্কট সময় আসিতে পারে। তাহার জন্য এই ঔষধ রাখিয়া যাইতেছি। জ্বরটা ছাড়িবার সময় এই ঔষধটা প্রথমে খাওয়াইয়া দিয়া, তার্‌পর না হয় আমাকে সংবাদ দিবেন।"

সমস্ত দিন কাটিল। রাত্রি আসিল। রজনীরও তিনটী যাম কাটিয়া গেল। শেষ যামে রোগীর মৃদু মৃদু ঘাম হইতে লাগিল। ইয়াশিন সমস্ত রাত্রিটা পূর্ব্বরাত্রের মত নিদ্রাহীন নেত্রে কাটাইয়াছে। সে রাত্রেও অতি সতর্কভাবে সে রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছে।

হকিমের উপদেশ মতে সে তখনই সেই সাংঘাতিক অবস্থার জন্য ব্যবস্থিত

দাওয়াইটী খাওয়াইয়া দিল। জ্বর ছাড়িবার সময় রোগী বড়ই ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল—ঔষধ সেবনের অব্যবহিত পরেই, সে নিদ্রিতা হইল।

ইয়াশিন—শেষ রাত্রে হকিমের বাড়ীতে গিয়া তাঁহাকে রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে খুলিয়া বলিল। হকিম আবার তাহার সঙ্গে আসিলেন ও রোগীর অবস্থা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন—"ইয়াশিন সাহেব! কোন ভয় নাই। রোগী এ যাত্রা প্রাণে বাঁচিয়া গেল।"

কথাটা শুনিয়া ইয়াশিনের খুবই একটা আনন্দ হইল। সে হকিমকে আশার অতীত পারিশ্রমিক দানে পুরস্কৃত করিল।

বলা বাহুল্য—গুল্ সে যাত্রা মরিল না। কিন্তু তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে যে সব ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা ভাবিতে গেলে বোধ হয়, এ ক্ষেত্রে মৃত্যুই তাহার শ্রেয়ঃ ছিল।

কিন্তু এই জন্ম মৃত্যুর ব্যবস্থা ত মানুষের হাঁতে নয়। সবই যে বিধাতার নিয়মে সূচিত।

এই ভয়ানক ব্যাপারের পর, এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। গুল্‌নেয়ার দৈহিক স্বাস্থ্য অনেকটা পূর্ব্ববৎ অবস্থায় ফিরিয়া পাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মনের অবস্থা অতি শোচনীয়। সে প্রায়ই বলিত—"হায়! যে মূর্চ্ছা আমায় এ কয়দিন অধিকার করিয়াছিল, তাহার অবসানে আবার চেতনা ফিরিয়া আঁসিল কেন? আমার সর্ব্বস্ব যে ছিল, আমার জীবনের ধ্রুবতারা যে ছিল—সে যখন চলিয়া গেল, তখন আমার বৃথা বাঁচিয়াই বা ফল কি? এ বিড়ম্বনাময় জীবন, এ জ্বালাময় প্রাণ, থাকিলেই বা কি—গেলেই বা কি?"

নির্জ্জনে থাকিলে, সে কাশেমের সেই অঙ্গুরীয়টী লইয়া চুম্বন করিত্। আর বলিত—"প্রিয়! দয়িত! আমার সর্ব্বস্ব! তুমি যে আমার প্রতি

চিরদিনই করুণাময়। তবে বল প্রভু! বল কান্ত! কেন আমার উপর এত নিষ্ঠুর হইলে? আমি ত তোমার চরণে কোন অপরাধই করি নাই।”

এই কথাগুলি বলিবার সময়, তাহার পাংশুমলিন বিশীর্ণ গণ্ড দিয়া প্রবল অশ্রুধারা গড়াইত। তাহাতে তাহার বুকের কাপড় ভিজিয়া যাইত। এ নির্জ্জন ক্রন্দনে সান্ত্বনা করিবার ত কেহই নাই। সুতরাং সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, আপনিই শান্ত হইত।

রোগ মুক্তির পর, গুল্ প্রায়ই উদ্যানে বেড়াইতে আসিত। একদিন সে মর্ম্মরবেদীর উপর বসিয়া নানা কথা ভাবিতেছে, এমন সময়ে ইয়াশিন সেখানে দেখা দিল। গুল্ তাহার বাটীর যেখানে থাকুক না কেন, ইয়াশিনের সকল স্থানেই প্রবেশাধিকার অব্যাহত।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। আকাশ গাত্র হইতে অস্তগামী অরুণের রক্তরাগ ক্রমশঃ মুছিয়া যাইতেছে। স্নিগ্ধ সান্ধ্য সমীরণে, গুলের অলকগুলি ধীরে ধীরে উড়িতেছে। সেই স্থানে দুইটী ক্ষুদ্র মর্ম্মর-বেদী পাশাপাশি ভাবে ছিল। গুল্—ইয়াশিনকে তাহার নিকট বসিতে বলিল।

গুল্ একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—“ইয়াশিন! তোমার ঋণ আমি এ জীবনে শোধ করিতে পারিব না। তুমিই চেষ্টা করিয়া আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছ! কিন্তু এখন বুঝিতেছি, মৃত্যুই আমার ভাল ছিল। আমাকে বাঁচাইয়া তুলিয়া ভাল কাজ কর নাই তুমি।”

ইয়াশিন এ কথার কোন উত্তর দিল না। কি উত্তর দিবে সে? সে ধীর স্বরে বলিল—“স্নেহময়ী গুল্! দেখিতে দেখিতে ত একমাস কাটিয়া গেল। এ অভিশপ্ত বসোরা আর আমার ভাল লাগিতেছে না। আমার মনের ইচ্ছা এই, দিন কতক না হয় ঘুরিয়া আসি। এ সংসারে আমার

মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, পত্নী নাই, আপনার বলিতে কেহই নাই। ছিল এই উদারপ্রাণ কাশেম। সে যখন চলিয়া গেল—আমার এখানে থাকায় কোন প্রয়োজন নাই। সেই জন্য মনে করিতেছি—মাস কয়েকের জন্য কোন দূর দেশে গিয়া থাকি ?"

গুল্‌নেয়ার বলিল—"তাহা হইলে এই বিরাট নিরাশা, সীমাহীন বিপদ, আর অসংখ্য দায়িত্বের মধ্যে, তুমি আমায় একা ফেলিয়া যাইতে চাও ? কি নিষ্ঠুর তোমার এ কল্পনা ইয়াশিন ?"

ইয়াশিন। তুমিও আমার সঙ্গে চল না কেন ?

গুল্‌। নানা কারণে তাহা অসম্ভব। প্রধান কারণ—তোমার অগ্রজই আমায় বলিয়াছিলেন,—"গুল্‌নেয়ার ! এই ভিটা আমার জন্ম স্থান। তোমার সহিত আমার মিলনের স্থান। যদি আমার অবর্ত্তমানে কখনও তোমার খুবই কষ্ট হয়, তাহা হইলেও এ পবিত্র ভিটা ত্যাগ করিও না।"

ইয়াশিন মনে মনে গুলের কথাগুলি আলোচনা করিয়া বলিল "তাহা হইলে আমার আর যাওয়া হয় না। কিন্তু গুল্‌! এ সব ঘটনায় স্মৃতির যন্ত্রণা যে কত ভয়ানক, তাহাও ত বুঝিতেছ ?"

কি একটা কথা তখনই মনে মনে ভাবিয়া, গুল্‌ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"ভাল ! আর একটী মাস তুমি অপেক্ষা কর। আমারও ইচ্ছা এই—সংসারে লিপ্ত থাকিলে, আর এ বাটীতে থাকিলে একটুও মনের শান্তি পাইব না। আমার স্বামী প্রচুর ঐশ্বর্য্য রাখিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি পতিশোককাতরা অভাগিনী দেওয়ানা। তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তিতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। কেননা, এই সম্পত্তি একা ভোগ হয় না। যে আমাকে সুখে রাখিবার জন্য এ ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়াছিল—সে আমাকে জন্মের মত

ছাড়িয়া গিয়াছে। তুমিই এখন আমার স্বামীর সম্পত্তির রক্ষক। একটা কথা তোমায় বলিব ভাবিতেছিলাম। আজ সেই সুযোগ উপস্থিত। আমার ইচ্ছা—যে এই তিলে তিলে সঞ্চিত ধনভাণ্ডার, কোন ধর্ম্মশালায় দান করিয়া আমি পবিত্র মক্কাধামে চলিয়া যাই। ঐশ্বর্য্যের ভোগে সুখ নাই, দানেই প্রাণের আনন্দ। এই কথাটাই আমি আজকাল খুবই ভাবিতেছি।"

ইয়াশিন বলিল,—"সাধ্য মতে চেষ্টা করিয়া দেখ যদি মনে একটুও শান্তি ও দৃঢ়তা আনিতে পার। আমাদের কবি হাফেজ লিখিয়াছেন—"সময়ের মত নিদানদর্শী উৎকৃষ্ট চিকিৎসক আর নাই।" সময়ে হয়ত শোকের এই প্রভাবটা কমিতে পারে। এখন প্রাণের আবেগে, দারুণ নিরাশায়, যাহা বলিতেছ—পরে হয়তো এই সঞ্চিত অর্থ হস্তচ্যুত হইলে, তোমায় অনুতপ্ত হইতে হইবে। কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। মানবের মন তাহার ইচ্ছাধীন, বটে, কিন্তু পরমায়ু ত নয় গুল্। আর যে কাজ তুমি করিতে বলিতেছ, তাহা দুই এক সপ্তাহে ত শেষ হইতেই পারে না। দুই চারি মাসে হয় কিনা তাহাতেও সন্দেহ!

গুল্‌নেয়ার বলিল—"কেন—এত দেরী হইবে কেন?"

ইয়াশিন বলিল—"দেরীর কারণ অনেক। প্রথম কারণ এই—এখনও বসোরা সহরে কাশেমের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয় নাই। আর এসব সংবাদও বেশী দিন চাপা থাকে না। তাঁহার মৃত্যু সংবাদটা বাহিরে প্রচারিত হইলে—অনেক দেনদার তাহাদের দেনার কথা অস্বীকার করিবে। তারপর এই সহরে ও অন্যান্য স্থানে, কাশেমের হীরা-জহরতের কারবারের জন্য যে সমস্ত লেন্-দেন্ হইয়াছে, তাহার হিসাব-নিকাশ করাও প্রচুর সময় সাপেক্ষ। কাজেই এ সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি কাজ করিবার চেষ্টা যতই করি না

কেন—প্রকৃত পক্ষে কাজ অগ্রসর করিতে বড়ই দেরী হইবে। তুই চারি মাস যাইতে দাও। এর মধ্যে তোমার ইচ্ছানুসারে সব কাজ শেষ করিয়া লইয়া, তোমার সংকল্পিত বিষয়টী কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিব।"

গুল্ ইয়াশিনের কথাগুলি মনে মনে আলোচনা করিয়া ভাবিয়া দেখিল—ইয়াশিন যাহা বলিতেছে, তাহাই ঠিক। তাড়াতাড়ি করিলে, এসব হাঙ্গাম সহজে মিটিবে না। সে মনে ভাবিল—"যখন দুঃখ সহাই আমার প্রাক্তনলিপি, তখন নীরবে এই দুঃখটাকেই, রমণীর প্রধান গুণ যে সহিষ্ণুতা—তাহার সহায়তাতেই দূরে সরাইয়া রাখিবে।"

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া, গুল্ একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"ভাল তাহাই হইবে। তোমার এ সঙ্গত প্রস্তাব আমি শুনিতে বাধ্য।

গুল্ উদ্যান ত্যাগ করিয়া তাহার নিজের কক্ষে প্রবেশ করিল। আর ইয়াশিনও গুলের এই শোচনীয় ভাগ্য পরিবর্ত্তনের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, নিজের বাটীতে প্রস্থান করিল।

(৭)

শয়তান বাহিরের কোন স্থান হইতে আসিয়া মানুষের মনে প্রবেশ করে না। সে তাহার মনের মধ্যেই থাকে।

মানুষের ধর্ম্মজ্ঞান যতক্ষণ প্রখর থাকে, বিবেক পূর্ণশক্তিতে জাগিয়া থাকে, হৃদয়ের মধ্যে কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রবল থাকে, পাপ পুণ্যের বিচার শক্তি থাকে, লোভ লালসার শক্তি শিথিল থাকে, তখন এই শয়তান মানুষের মনের মধ্যে থাকিয়াও, তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। সহস্র চেষ্টাতেও নয়।

কিন্তু এই বিধিপ্রদত্ত শ্রেষ্ঠ চিত্তবৃত্তিগুলি, যখন ঘটনাচক্রপীড়নে ক্রমশঃ শক্তিহীন ও শিথিল হইয়া আসে, তখন শয়তান প্রতিপদেই দেবতুল্য মানবকেও তাহার অধীন করিবার চেষ্টা করে।

ইয়াশিনের মত বন্ধুবৎসল, একান্তানুরক্ত, হিতকামী, কৃতজ্ঞ সুহৃৎ, কাশেমের আর কেহই ছিল না। ইয়াশিনকে কাশেম যেমন কনিষ্ঠ সহোদরের মত ভাবিত, ইয়াশিনও সেইরূপ কাশেমকে জ্যেষ্ঠ অগ্রজতুল্য সম্মান করিত।

কাশেম দুনিয়ায় কাহাকেও বিশ্বাস করিত না, করিত—কেবল এই ইয়াশিনকে। ইয়াশিন রক্তসম্পর্কেও তাহার পর ছিল না। এই কাশেমের পিতার সহিত ইয়াশিনের পিতার খুব একটা একাত্মভাব ছিল। কাশেম যাহাতে সেই ভাব আরও দৃঢ় ও দুশ্ছেদ্য হয় তাহার চেষ্টাই করিয়াছিল। আর তাহা যে হয় নাই, তাহাও বলিতে পারি না। কারণ তাহা না হইলে ইয়াশিনের নিকট তাহার সর্ব্বস্ব, এমন কি পত্নীকে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়া সে রাখিয়া যাইত না। ইয়াশিনের এই আত্মসমর্পণের, একান্ত সৌহৃদ্যের, গভীর বিশ্বাসের ভাব দেখিয়া, কাশেমের মনে, এমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, যে সে ইয়াশিনকে তাহার অন্তঃপুর মধ্যে অবাধ গমনের ও গুলের সহিত স্বাধীনভাবে মেলামেশা করিবার পূর্ণ অধিকার দিয়াছিল। আর ইয়াশিন—সেও প্রকৃতপক্ষে অতি কৃতজ্ঞ, অতি সংযত ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। রূপে গুণে সকল বিষয়েই অতুলনীয়।

কিন্তু এই দেবতুল্য ইয়াশিনের হৃদয়, যাহাতে কখনও কোন কলঙ্কের দাগমাত্র পড়ে নাই, তাহা এইবার শয়তানের শক্তির অধীন হইল।

এতদিন সে ভাল করিয়া গুলের সুন্দর শ্রী, ভুবনমোহিনী কান্তি

দেখিবার অবসর পায় নাই বা ইচ্ছা করিয়া দেখে নাই। কেন না তাহার হৃদয় দেবত্বের রশ্মিতে সমুজ্জল ও প্রদীপ্ত ছিল, পাপ ও কলঙ্কের ছায়া তাহাতে স্পর্শ করে নাই। জ্যেষ্ঠ সোদরতুল্য কাশেমের পত্নী বলিয়া সে এই গুল্‌কে ভক্তি ও স্নেহপূর্ণ চক্ষে দেখিত।

কিন্তু কি কুক্ষণেই সে গুলের মূর্চ্ছিত দেহের পাশে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিয়াছিল! সেই মূর্চ্ছাক্রান্ত অনাবিল অফুরন্ত সৌন্দর্য্য, তাহার প্রাণে একটা তীব্র মাদকতার উদ্রেক করিয়া দিল। তার পর শয়তান আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বলিল—"কাশেম মরিয়াছে, তোমার পথ এখন নিষ্কণ্টক। আজ তুমি সতৃষ্ণ নেত্রে যে সৌন্দর্য্য দেখিতেছ, তাহা উপভোগ করিবার জন্য. তুমিই সৃষ্ট হইয়াছ—তাহা না হইলে কাশেম এত শীঘ্র মরিবে কেন?"

"তোমার সংসারে আহা বলিতে কেহ নাই, তোমার জীবন লক্ষ্যশূন্য ও অন্ধকারময়। তোমার আঁধার গৃহ উজ্জ্বলিত করিবার জন্যই, এই অপূর্ব্ব রূপপ্রভাময়ী স্বর্ণপ্রতিমা গুল্‌নেয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে।"

শয়তানের এ উপদেশবাণী ইয়াশিনের পবিত্র হৃদয়ে ক্রমশঃ দৃঢ় শক্তি বিকাশ করিল। নির্জ্জনতার অবসরে, এদানীং সে কেবল এই গুল্‌নেয়ারের চিন্তাতেই বিভোর হইয়া থাকিত। সহস্রবার সে মনে ভাবিয়াছিল, আর কখনও সে গুল্‌নেয়ারের সন্মুখে যাইবে না। এই সাংঘাতিক প্রলোভনের কবল হইতে মুক্তি লাভের জন্য, তাহাকে জন্মভূমি বসোরা ত্যাগ করিতে হয় তাহাতেও সে প্রস্তুত। কিন্তু হায়! কি যেন একটা অদৃশ্য শক্তি, কি যেন একটা তীব্র আকর্ষণ, যেন তাহাকে গুল্‌নেয়ারের কাছেই ক্রমাগতঃ টানিয়া লইয়া যাইতেছে। সে প্রবল চেষ্টা করিয়া তাহাতে একটুও বাধা দিতে পারিতেছে না!

ইয়াশিন ভাবিল হায়! কেন তাহার এ চিত্ত বিপর্য্যই ঘটিল? কেন শয়তান ধীরে ধীরে তাহাকে এক মহাপাপের কণ্টকময় পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। মনের মধ্যে অন্বেষণ করিলে সে দেখিতে পায়, গুল্‌নেয়ার তাহার অন্ধকারময় হৃদয়কে আলো করিয়া, রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে বসিয়া আছে। চক্ষু চাহিয়া থাকিলে সে দেখে—যেন গুল্‌নেয়ার তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, ওষ্ঠাধর টিপিয়া মৃদুমন্দ হাসিতেছে।

রূপ! রূপ! রূপ! হায়! এতরূপ লইয়া কেন এই গুল্‌নেয়ার এ দুনিয়ায় আসিয়াছিল? আসিয়াছিল—ত আমায় মজাইল কেন? যদি মজাইল—তবে সে দূরে সরিয়া যায় কেন? ধরি ধরি করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিতেছি না কেন?

সেইদিন রাত্রে সে অনেক কষ্টে চিত্তকে আয়ত্ব করিয়া, মনে মনে স্থির সঙ্কল্প করিল—এই সাংঘাতিক প্রলোভন হইতে দূরে সরিয়া যাওয়াই উচিত!

তাহার চিত্তের এই বিপ্লবময় দুর্ব্বলতা দেখিয়া, শয়তান তাহার কাণে কাণে বলিল—"যদি তাই হয়, যদি চিত্ত দমন করিতে একান্তই অসমর্থ হও, তাহা হইলে গুলের কাছ হইতে সরিয়া যাও। কিন্তু কাশেমের নিকট তুমি যে ধর্ম্ম শপথ করিয়াছিলে, যে তাহার অবর্ত্তমানে তুমি তাহার পত্নীর তত্ত্বাবধান করিবে! তুমি তাহাকে এরূপ বিপদের মুখে ফেলিয়া গেলে, লোকে মনে করিবে কি? এ দুনিয়ার সহস্র প্রলোভন, কাণ্ডজ্ঞানহীন রূপ-লোলুপ দুর্জ্জনের অত্যাচার,যখন অভাগিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে, তখন তাহাকে রক্ষা করিবে কে? তুমি যে এই মৃত কাশেমের নিকট প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? এই কাশেম যে তোমাকে

সোদরতুল্য স্নেহ করিত। তাহার জন্যই যে আজ তোমার সামাজিক মানসম্ভ্রম ও উন্নতি। তুমি দশের মধ্যে একজন। আর এ কথা এ সহরে কেই বা না জানে? এত শীঘ্র পতিবিয়োগবিধুরা এই গুলের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলে, তাহাকে রক্ষকবিহীন অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া গেলে, লোকে যে তোমাকে নিমকহারাম বলিবে!"

"ধীরে কাজ কর ইয়াশিন! ধীরে! এ সব ব্যাপারে ব্যস্ত হইতে নাই। তোমার সহিষ্ণুতাই এই অমূল্য রমণীরত্নকে তোমার হাতে তুলিয়া দিবে। শোক চিরদিন থাকে না, দুঃখ চিরদিন থাকে না, চোখের জল চিরদিন থাকে না। বর্ষা যায়, বৃষ্টি যায়, শীত যায়, তুষার যায়, আবার মলয়চুম্বিত বসন্তে প্রাণহীন, রসহীন, আনন্দহীন ধরা হাসিয়া উঠে। একদিন দেখিও, এই গুল্‌নেয়ারের মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠিবে। প্রিয়জন-বিরহে সবাই কি চিরদিন কাঁদে? শান্ত হও—ইয়াশিন! চঞ্চল হইও না।"

শয়তানের এ ছলনাময় বাণীতে, ইয়াশিন তাহার শক্তির অধীন হইল। শয়তান সৃজিত এই মোহের ফলে, গুলের জীবনের ভবিষ্যৎ ব্যাপারগুলি সকল দিক দিয়া বুঝিয়া ভাবিয়া, আলোচনা করিয়া সে স্থির করিল, গুল্ তাহাকে ডাকিয়া না পাঠাইলে সে স্বেচ্ছায় আর তাহার সম্মুখে যাইবে না। প্রলোভনের অতি নিকটে থাকিয়াই সে বীরের ন্যায় চিত্তদমন করিবে! এক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে, আরও এক মাস যাক্! তার পর সে তাহার মনের শক্তি পরীক্ষা করিয়া, ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ত্তব্য স্থির করিবে।

এই সব চিন্তার পর সেদিন অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন মনে, শান্ত হৃদয়ে, ইয়াশিন শয্যায় শুইল। কিন্তু হায়! নিদ্রাতেও যে তাহার নিস্তার নাই!

নিদ্রায় সে স্বপ্ন দেখিল। সে স্বপ্ন অতি বিভীষিকাময়! সে দেখিল, মৃত

কাশেম তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া। তাহার মুখশ্রী পাণ্ডুবর্ণ—নেত্রদ্বয় কোটর-নিমগ্ন, আর সে নেত্রে ভীষণ-ভ্রুকুটী। সে নেত্রের প্রখর দীপ্তি যেন ইয়াশিনের চক্ষুকে ঝল্‌সাইয়া দিল।

ইয়াশিন শুনিল—কাশেম যেন তাহার দিকে অঙ্গুলিহেলনে বজ্রনির্ঘোষে বলিতেছে—"ইয়াশিন! সাবধান! এত শীঘ্র নেমকহারামী করিও না। আমি মরিয়াছি বটে, কিন্তু জীবিতের অপেক্ষা মৃতের প্রতিশোধ অতি ভয়ানক! গুলনেয়ারের রক্ষার ভার তোমায় দিয়াছি। আমার এই ন্যস্তবিশ্বাস নেমকহারামী করিয়া নষ্ট করিও না। আজীবন নরকের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিবে। শান্তি কোথাও পাইবে না—ইহলোকেও নয়—পরলোকেও না।"

স্বপ্ন দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই, ইয়াশিনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে ভয়ে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। শয্যা হইতে ত্বরিতে উঠিয়া বসিয়া, নেত্র মার্জ্জনা করিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কই কোথাও ত কেহ নাই! কাশেমের প্রেতমূর্ত্তির ছায়া পর্য্যন্ত নাই! সবই ভ্রম! সবই উষ্ণ মস্তিষ্কের বিকৃত খেয়াল! স্বপ্ন—চিরদিনই মিথ্যা।

সে মনে মনে ভাবিল, দিনরাত কাশেমের সম্বন্ধে চিন্তা করায় গুলের ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা করায়, সে এইরূপ বিকট স্বপ্ন দেখিয়াছে। কেননা লোকে যে বিষয় ক্রমাগত চিন্তা করে, সেই সম্বন্ধেই সে স্বপ্ন দেখে।

এও কি সম্ভব—যে মরিয়াছে, ইহলোকের সহিত যাহার কোন সম্পর্ক নাই, সে কখনও কায়া লইয়া উঠিয়া আসিয়া বিভীষিকা দেখাইতে পারে? যাই হোক্—গুলের সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিলেই ত চলিবে। তার পর

একদিন গোপনে এ সহর ত্যাগ করিয়া দূরদূরান্তরের কোন অজানা দেশে চলিয়া যাইব। প্রলোভন, পাপ, শয়তান আমার কি করিবে? এই সব ভাবিয়া সে গুলের সহিত সাক্ষাৎ করা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল।

(৮)

কাশেমের বিয়োগে, গুলের চোখের সম্মুখ হইতে যেন সকল সৌন্দর্য্য ঝরিয়া পড়িয়াছে। সমস্ত জগত তাহার চক্ষে মৃত। জড় প্রকৃতির মুক্ত সৌন্দর্য্য, যেন শোকের কৃষ্ণবসনে আবৃত।

কাশেমের একখানি তৈলচিত্র ছিল। সে—সেই চিত্রখানি নিত্য পুষ্পমাল্যে শোভিত করে। তাহার চারিদিকে সুগন্ধি বর্ত্তিকা জ্বালিয়া দেয়। কক্ষমধ্যস্থ এক ক্ষুদ্র বেদীর মত স্থানে সেই চিত্রখানি রাখিয়া যোড়করে অশ্রুপূর্ণনেত্রে, মৃদুস্বরে বলে—"আমি তোমার চরণে কি অপরাধ করিয়াছি কাশেম—যে তুমি দাম্পত্য-প্রেমের সকল প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গিয়া দিয়া, আমায় চরণে দলিত করিলে? এ শূন্য জীবন লইয়া কি করিব আমি? মৃত্যুকে এত ডাকিতেছি, তবুও ত সে কৃপা করে না। দেখিতেছি, সর্ব্বসন্তাপহারী এই মৃত্যুই এখন আমার পরম সখা। সেই—এখন তোমার ও আমার মধ্যে ইহলোক ও পরলোকের সংযোগ-সেতু। চেষ্টা করিলে ত আমি নিজের মৃত্যু ঘটাইতে পারি। এ মৃত্যু ঘটাইবার ত সহস্র উপায় আছে। কিন্তু তুমি—তুমি! হে আমার প্রাণের দেবতা! তুমিই একদিন আমায় শিখাইয়াছ, যদি আমি আগে মরি, আমার সহিত পরলোকে মিলিত হইবার জন্য, সহিষ্ণু হৃদয়ে এ দুনিয়ায় অপেক্ষা করিও। অন্যায় উপায়ে, অধর্ম্ম সহায়ে, কখনও মরণকে অসহিষ্ণু চিত্তে আশ্রয়

করিও না। জানিও, তাহা হইলে এই স্বাভাবিক মৃত্যুই ঠিক সময়ে আমার কাছে তোমাকে লইয়া যাইবে। যাহারা পরলোকগত প্রিয়জনের বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া, আত্মহত্যা করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করে, তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আত্মহত্যা—মহাপাপ! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। ইহাতে বেহেস্তের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়।"

একবার ছায়ামূর্ত্তিতে দেখা দাও—আমার প্রাণাধিক, জীবনসর্ব্বস্ব কাশেম! আমি তাহা হইলে অনেকটা শান্তি পাইব। বড় জ্বালায় জ্বলিতেছি আমি। কিসে এ জ্বালার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব? সে শুভদিন কতদূরে, যেদিন ইপ্সিত মৃত্যু আসিয়া আমাকে তোমার সহিত মিলাইয়া দিবে?

এইভাবের অনুশোচনায়, আক্ষেপে, হা-হুতাশে অশ্রুধারা বর্ষণে সে যেন অনেকটা শান্তি পায়। তার পাষাণের ভার চাপানো প্রাণটা, যেন একটু হাল্‌কা হইয়া পড়ে। তাহার প্রাণের বেদনা, যেন একটু শান্ত হয়।

তিনটী দিন চলিয়া গিয়াছে। ইয়াশিন এর মধ্যে তাহাকে একবারও স্বেচ্ছায় দেখা দেয় নাই। এর কারণ কি—সে কিছুই বুঝিয়া পাইল না। সে ভাবিল, সেদিনকার কথার জন্য ইয়াশিন বোধ হয় তার উপর বিরক্ত হইয়াছে! কিম্বা সে তাহার শোকক্লিষ্ট বিশীর্ণ বিমলিন অবস্থা দেখিতে বড়ই নারাজ। তাই সে আজকাল না ডাকিলে আসে না।

সে দিন সে এই সব মনে ভাবিয়া, ইয়াশিনকে ডাকিতে পাঠাইল।

যখন বৃদ্ধা দাই গিয়া ইয়াশিনকে বলিল—"বিবি সাহেবা আপনাকে সেলাম দিয়াছেন," তখন ইয়াশিন মহা ফাঁপরে পড়িল। দাইকে বিদায় করিয়া দিয়া, সে মনে ভাবিতে লাগিল—"নির্ব্বোধ পতঙ্গের আবার মত সেই জ্বলন্ত বহ্নিমুখে যাইব কি না?"

শেষ সে যাওয়াই স্থির করিল। এরূপ ধরণের সাক্ষাতে এতদিন ত কোন দোষই ছিল না, বা সে কোন অপরাধই জ্ঞান করিত না। তবে এখন এ ভাবান্তর হয় কেন? তাহার মনের ভিতরের গুহ্য ও অব্যক্ত পাপই যে এইরূপ লজ্জা ভয় ও সংকোচের কারণ তাহাও সে বুঝিল।

সত্য কথা বলিতে কি, এই কয় দিন সে গুল্‌কে দেখে নাই, অনেক কষ্টে তাহার সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়াছিল—কিন্তু তাহার ফলে তাহার মনে দর্শনের খুব একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল। ইহাই ব্যাধির সঙ্কট লক্ষণ।

গুলের এই আহ্বানে সে সংকোচ ভাবটা একটু কমিল বটে, কিন্তু অন্তরের ভিতরের খুব গোপনে লুক্কায়িত আকাঙ্ক্ষাটা একটু জোর সঞ্চয় করিল।

গুল্ তাহার কক্ষের সম্মুখস্থ বারান্দায় ইয়াশিনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সে এক দৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছিল, এমন সময়ে ইয়াশিন যেন কত অপরাধীর মত, সংকুচিত হৃদয়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

গুল্ তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে নিজের চিন্তায় এত বিভোর, যে ইয়াশিনের সাবধানবিন্যস্ত পদক্ষেপের মৃদুধ্বনিও তাহার শ্রুতিস্পর্শ করে নাই।

ইয়াশিন্ পিছন হইতে বলিল—"কেমন আছ তুমি গুল্?"

গুল্‌নেয়ার একটু মলিন হাস্যের সহিত বলিল—"খোদা যেমন রাখিয়াছেন! কিন্তু তোমার ব্যাপার কি? তিন তিন দিন তোমার কোন খবরই নাই! আমার এ দুর্দ্দিনে তুমি যদি আমার কোন সংবাদ না লও, তাহা হইলে আর কে আমাকে দেখিবে ইয়াশিন্?"

এ কথার উত্তর ইয়াশিন্ যে কি দিবে, তাহা সে খুঁজিয়া পাইল না। জ্ঞানপাপী—সে। তাহার মনের ভিতরে লুকানো এক অতি সাংঘাতিক পাপ! বাসনার প্রবল তুষানলে, তাহার বুক পুড়িয়া ছাই হইতেছিল।

ইয়াশিন একবার ভাবিল—মনোভাব প্রকাশের এই উপযুক্ত অবসর। এই অবসরেই ইহার নিকট আমার মনের কথা ব্যক্ত করি। কিন্তু তাহার সাহসে কুলাইল না। কি যেন একটা ভয়ে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। স্বপ্নে দৃষ্ট কাশেমের রোষকষায়িত সেই ভীষণ মূর্ত্তি, প্রতিহিংসার কথা, তখনই তাহার স্মৃতিপটে উদিত হইল। কাজেই সে নির্ব্বাক্ অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিয়া বলিল—"আজকাল তোমাকে দেখিতে আসিতে বড় ভয় হয়—বড় কষ্ট হয়—তাই আসি না। তোমায় দেখিলে আমার অনেক কথা মনে হয়—তাই আসিতে সাহস করি না। স্মৃতির যন্ত্রণা—দুঃখের যন্ত্রণা—বড়ই ভয়ানক। স্মৃতিই, দুঃখকে প্রবল করিয়া দেয় যে গুল্।"

গুল্‌নেয়ার বলিল,—"তাহা সত্য বটে। এটা হইতেছে তোমার অত্যধিক স্নেহের ফল। তুমি চিরদিনই আমায় কনিষ্ঠা ভগ্নির মত স্নেহ করিয়া আসিতেছ। আমার এ দারুণ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে, কাজেই তোমার একটা কষ্ট হইবারই কথা। কিন্তু এ অভাগিনীর অদৃষ্টের সকল সুখদুঃখের বিধাতা—সেই খোদা। তিনি একদিন আমাকে কত সুখে সুখী করিয়াছিলেন—আজ অপরিমেয় দুঃখ দিয়াছেন। কাজেই সুখের মত এ দুঃখও আমাকে নীরবে সহিতে হইবে। তোমার, কিম্বা এ জগতে কাহারও ক্ষমতা নাই, যে আমার এ দুঃখের প্রতিকার করিতে পারে।"

পাপিষ্ঠ ইয়াশিন একবার মনে ভাবিল, এইবার বলিয়া ফেলি—"এ দুঃখের প্রতিকার খোদার হাতে নয় গুল্‌নেয়ার—তোমার নিজের হাতে। এ দুঃখের

প্রতিকার আমিই করিতে পারি—যদি তুমি সদয় হও। এ অভাগার দিকে একটু কৃপানেত্রে চাহিয়া দেখ।” কিন্তু এত বড় কথাটা বলিতে তাহার সাহস হইল না। বলি বলি করিয়াও বলা হইল না। সে তাহার মনের কথাটা চাপিয়া রাখিয়া বলিল—“যাই হোক্, আমায় ডাকিয়াছিলে কেন?”

গুল্। কেন ডাকিতে কি নাই?

ইয়াশিন। তা নয়, কোন প্রয়োজন আছে কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

গুল্। দেখ ইয়াশিন! নিজের দিক হইতে আমার প্রয়োজনের সংখ্যা এখন অনেক কমিয়া আসিয়াছে। হাঁ,—একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি। দাই বলিতেছে—এক মাসের জন্য সে তার বোনঝির বাড়ী যাইবে। সেই মেয়েটী সঙ্কট পীড়ায় ভুগিতেছে। তবে—সে গ্রামটা দু’দিনের পথ। আর তাহার ফিরিতে বোধ হয় মাসখানেক দেরী হইবে। এই একমাস কাল সঙ্গিনীহীন অবস্থায় কাটানো আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর। যদি কোন সদ্বংশীয়া দরিদ্রা স্ত্রীলোক এই একমাসের জন্য আমার কাছে থাকিতে স্বীকৃতা হয়, তাহার একটা বন্দোবস্ত তুমি করিয়া দাও।”

এই সময়ে শয়তান ইয়াশিনের মনে আবার আধিপত্য বিস্তার করিল। প্রবৃত্তি লইয়াই মানুষ জন্মিয়াছে—তা সে কু-ই হউক আর সু-ই হউক। কোনটাকেই সে ত্যাগ করিতে পারে না। যখন যেটা শক্তিসঞ্চয় করে, তখন তাহার শক্তিকে পরাজিত করিতে না পারিলে, সেইটীর অধীনতাই তাহাকে স্বীকার করিতে হয়। ইয়াশিনের কু-প্রবৃত্তিটা, এই সময়ে শক্তি সঞ্চয় করিয়া উঠিল। সে ঘোর নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে, আশার একটু উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইল।

সে বলিল—"তার আর আশ্চর্য্য কি ? আমার পরিচিত এক অদ্ধবয়সী দরিদ্রা আছে। অবশ্য সে ভদ্রকুলসম্ভূতা। বোধ হয়, কালই তাহাকে জোগাড় করিতে পারিব।"

গুল্ বলিল—"দাই বড় ব্যস্ত হইয়াছে। যাহাতে কাল হইতেই সে এখান হইতে অবসর পায়, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দাও।"

ইয়াশিন বলিল—"সেজন্য তোমাকে আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিতে হইবে না। যাহাতে তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে থাক, তাহার বন্দোবস্ত করিতে আমি সম্পূর্ণ বাধ্য।"

এই কথা বলিয়া ইয়াশিন তাহার অন্ধকারময় হৃদয়ে একটা অপূর্ব্ব আশার আলোক জ্বালিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

(৯)

ইয়াশিন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া সর্ব্বপ্রথমেই তাহার এক পরিচিত আত্মীয়ের নিকটে গেল। এই লোকটী, এক সময়ে অবস্থাপন্ন ছিল বটে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি বলিয়া তাহার সৌভাগ্যের স্রোত এখন বড়ই মন্দীভূত। প্রয়োজনে, দায়ে—অদায়ে, সে ইয়াশিনের নিকট টাকা কড়ি কর্জ্জ লইত। এইজন্য সে ইয়াশিনকে বড়ই ভালবাসিত। তাহার বড়ই বাধ্য ছিল।

লোকটার নাম জাফর মহম্মদ। জাফর তখন নির্জ্জন গৃহে বসিয়া সরাব পান করিতেছিল। সহসা ইয়াশিনকে তাহার কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইতে দেখিয়া জাফর বিস্মিতচিত্তে বলিল—"আরে দোস্ত এস! ভারি

সৌভাগ্য আমার যে—এ গরীবখানায় এতদিন পরে তোমার পায়ের ধূলো পড়্‌লো।"

ইয়াশিন এ আপ্যায়নে বিশেষ সন্তুষ্ট হইল না। কেন না, সে বহুবার তাহাকে অতিরিক্ত মাত্রায় সুরাপান ত্যাগ করাইবার জন্য, পীড়াপীড়ি করিয়াছিল। অনেক উপদেশ দিয়াছিল। এই জাফর তাহার সহপাঠী, বিশেষ স্নেহভাজন। কিন্তু উপদেশ শুনিতে সে বড়ই অবাধ্য। অনেক সময়ে এই অবাধ্যতার জন্য ইয়াশিন জাফরের উপর বড়ই বিরক্ত হইত। আবার সে দায়ে পড়িয়া যখন তাহার নিকট কর্জ্জ চাহিতে আসিত, তখন সে সাধ্যমতে তাহার বিপন্ন বন্ধুকে সাহায্য করিত।

যাই হোক্, উভয়ের মধ্যে অবস্থাগত একটা বৈষম্য থাকিলেও, মনের অমিল ছিল না। ইয়াশিন তখন নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহার কাছে আসিয়াছে, সুতরাং সে সহাস্যমুখে জাফরকে বলিল—"তোমার কাছে একটা সামান্য উপকারের প্রত্যাশায় এসেছি জাফর!"

জাফর বলিল—"আমিও তো তোমার কাছে অসংখ্য ব্যাপারে উপকৃত। বল কি করিতে হইবে দোস্ত?"

ইয়াশিন গুলের জন্য একজন বাঁদী চায়। সে তখনই তাহার প্রয়োজনের কথাটী জাফরকে জানাইল।

জাফর বলিল—"এর জন্য তুমি এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছ? এক মাস কেন—চিরকালের জন্য সুরিয়াকে তুমি লইয়া যাওনা কেন—তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

জাফরের বিশ্বস্তা বাঁদীর নাম সুরিয়া। সে তখনই সুরিয়াকে ডাকাইয়া তাহার নূতন চাকরীর সম্বন্ধে সব ঠিক করিয়া দিল। আর সুরিয়া গরীব

বাঁদী। দুপাঁচ টাকা বেশী মাহিনা পাইতেছে দেখিয়া, সেও এই চাকরী গ্রহণে স্বীকৃত হইল।

জাফরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, ইয়াশিন তাহার বাটীতে ফিরিয়া আসিল। মনে মনে ভাবিল, এই গরীব বাঁদি সুরিয়ার সহায়তায় আমি আমার কাজ উদ্ধার করিব। উহার সহিত দুটো কথা কহিয়াই বুঝিয়াছি, টাকার লোভ উহার বড় বেশী।

সেই দিন গুলের সহিত সাক্ষাতের পর হইতেই ইয়াশিনের মনটা কে জানে—কেন খুবই চঞ্চল হইয়া পড়িল। গুলের সেই বিষাদ-কাতর মলিন মুখের মধ্যে সে যেন আরও একটা নূতন মাধুরী দেখিতে পাইল। সেই সুকৃষ্ণ তারকাময় চক্ষু—সেই অবেণীসম্বদ্ধ কৃষ্ণ কেশরাশি, সেই বীণানিন্দিত স্বর—সেই মরাল গতি! কি সুন্দর! হায়! হায়। খোদা এই গুল্‌কে যেন আদর্শ সুন্দরী করিয়া এ দুনিয়ায় পাঠাইয়াছেন।

পত্নী বিয়োগের পর হইতেই ইয়াশিনের জীবনটা নীরস ও মরুময় হইয়া পড়িয়াছিল। কাশেম তাহাকে পুনরায় বিবাহ করাইবার জন্য অনেক অনুযোগ উপরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে এ পর্য্যন্ত তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই। সর্ব্বদাই তাহাকে বলিত—"বেশ স্বাধীনভাবে আছি। জীবনটা যখন এই অবস্থাতেই আনন্দে কাটিয়া যাইতেছে, তখন একটা গলগ্রহ করিয়া ফল কি?"

কাশেমও জানিত—এই ইয়াশিনের চরিত্রের দৃঢ়তা খুব বেশী। তাহার চরিত্রে দোষ ঘটা কখনও সম্ভব নয়। কাজেই সে ইয়াশিনের মুখে এই ভাবের উত্তর শুনিয়া, আর কখনও পীড়াপীড়ি করে নাই।

সে দিন রজনীর নির্জ্জন অবসরে অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তার পর

ইয়াশিন মনে মনে সংকল্প স্থির করিল, আর এরূপ ভাবে যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। আশা ও নিরাশার সন্ধিস্থলে পড়িয়া, এরূপ নিষ্ঠুরভাবে পিশিয়া মরিতে পারি না। সুরিয়া গুলের বাঁদীরূপে নিযুক্ত হইয়াছে যখন, তখন আমার পথ অনেকটা পরিষ্কার। সেই বুড়া দাইটাকেই আমার বড় ভয় ছিল। সে এতদিন ছিল বলিয়া নির্জ্জনে গুল্‌কে মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে আমার সাহস হইত না। আমি এখন স্পষ্টই বুঝিতেছি, এই অফুরন্ত রূপশালিনী গুল্‌নেয়ারকে পত্নীরূপে না পাইলে, আমার জীবনে কখনও শান্তি আসিবে না। এ অপূর্ব্ব রূপ যদি আমার ভোগে না আসে—তাহা হইলে এ জীবনই নিষ্ফল।"

সে দিনের এই ভাবের চিন্তায়, সে যেন মনে একটা সাহস পাইল। দিনে দিনে শয়তানের প্ররোচনায় সে আত্মসম্ভ্রম, বিবেক, সংযম, সংকোচ সবই হারাইল।

একদিন সুরিয়াকে খুব নির্জ্জনে পাইয়া ইয়াশিন বলিল,—"তুই জানিস্ সুরিয়া! তোর উন্নতির জন্যই আমি তোকে, গুল্ বিবির বাঁদী করিয়া দিয়াছি। তোকে আমি খুব খুশী করিব, যদি তুই একটা কাজ করিস্।"

সুরিয়ার হাতে সেই সঙ্গে একটী চক্‌চকে মোহর গুঁজিয়া দিয়া, ইয়াশিন আশা-প্রফুল্লচিত্তে, উৎসাহসূচক স্বরে আবার বলিল—"একটা খুব সামান্য কাজ করিতে পারিবি কি না বল দেখি?"

সুরিয়া মোহর খুব কমই দেখিয়াছে। সামান্য একটা কাজের সূচনাতেই যখন একটী মোহর বক্‌শীস্—তখন কাজটা শেষ হইয়া গেলে, সে আরও কত বেশী পুরস্কার পাইবে। এইরূপ একটা আশায় উৎফুল্ল হইয়া সে সহাস্য মুখে বলিল—"জনাব আমার মা বাপ! আপনার জন্যই আজ আমি

এই আরামের চাকরী পাইয়াছি। আপনার হুকুম তামিল করিতে পারিলে আমি খুবই সুখী হইব!"

ইয়াশিন সুরিয়ার কথার ভঙ্গিতে সাহস পাইয়া বলিল—"কাজটা বেশী যে শক্ত—তা নয়। আমি একবার গুলনেয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাকে গোটা কত কথা নির্জ্জনে বলিতে চাই। আমার ইচ্ছা, যে কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে দুই ঘণ্টার ছুটী লইয়া তুই নিজের বাড়ীতে যা। এই অবসরে আমি তাহার সহিত আমার কথাটা শেষ করিয়া নিই।"

সুরিয়া বলিল—এ আর বেশী মামলা কি? আজই বিবির কাছে এই রাত্রের ছুটীর জন্য আমি আরজী করিয়া রাখিব।

ইয়াশিন। আচ্ছা সুরিয়া! প্রায় দুই সপ্তাহ হইল, তুইত এ বাড়ীতে আসিয়াছিস্। কিন্তু তোর বিবির ভাবগতিক কিছু বুঝিতে পারলি?

সুরিয়া। তার অবসর কই জনাবালি? আর হইলেও তাহার মনের ভাব বুঝিবার কোন উপায় নাই। প্রায়ই দেখিতে পাই, গুল্ বিবি, কাশেম সাহেবের একখানা ছবির কাছে বসিয়া চোখের জল ফেলিতেছে। নিজের মনে বিড়বিড় করিয়া কি বকিতেছে। আবার আমাকে দেখিলেই, সে যেন বিরক্তির সহিত সেখান হইতে চলিয়া যায়। মুখখানা দিনরাতই যেন মেঘে ঢাকা। কখনও ত সে মুখে একটু হাসি দেখিতে পাইলাম না। যতদূর বুঝি, তাহাতে কাশেম সাহেবের শোকটা বিবিকে বড়ই লাগিয়াছে।

ইয়াশিন। বলিস্ কি—এতদূর! তোর বিবির দেখিতেছি—সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি। আচ্ছা—কথাপ্রসঙ্গে আমার সম্বন্ধে কখনও কিছু বলে কি?

সুরিয়া। খুব কম! তবে আপনার কথা উঠিলে বলে, কাশেম সাহেবের অনেক বন্ধু ছিল, কেহই এ দুঃখের সময় আমায় দেখিল না। উমি যা করিতেছেন—তাই যথেষ্ট।

ইয়াশিন বুঝিল, গুলের বর্ত্তমান অবস্থা তাহার উদ্দেশ্য সাধনের পোষক নহে। তবুও সে শয়তানের প্ররোচনায় মরিয়া হইয়া উঠিল। সে মনে মনে স্থির সংকল্প করিল, "অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, সুরিয়ার অবর্ত্তমানের সুযোগে গুলের নিকট মনোভাব প্রকাশ করিব। ইহাতে যাহা ঘটে ঘটুক, তাহার জন্য আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।"

ইয়াশিনের টাকা খাইয়াই হউক, আর যে কারণেই হউক, সুরিয়া তাহার প্রভুপত্নীর নিকট হইতে সেই রাত্রের জন্য অবসর লইয়া, তাহার নিজ বাটীতে চলিয়া গেল। যাইবার সময় অবশ্য সে ইয়াশিনকে তাহার প্রস্থান সংবাদটা জানাইতে ভুলিল না।

ইয়াশিনকে শয়তান সে দিন পূর্ণ গ্রাস করিয়াছে। ধর্ম্ম, কৃতজ্ঞতা, সৌভ্রাত্র, সবই তাহার হৃদয়কে ছাড়িয়া পলাইয়াছে। দেব প্রকৃতির যে ছিল—সে তখন শয়তানের প্ররোচনায় পূর্ণ মূর্ত্তিতে পিশাচ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই দুনিয়াতে দুটো জিনিসের মোহ বড়ই প্রবল। এ দুটীর প্রথম হইতেছে "রূপ"—দ্বিতীয় "রূপেয়া"। জগতে যাহা কিছু পাপ, যে কোন অশান্তি, যে কোন অত্যাচার উৎপীড়ন, নর ও নারীর লাঞ্ছনা হত্যা সবই এই দুয়ের জন্য। এ দুনিয়ায় সকলেরই পক্ষে অধঃপতনের পথ যখন অতি সরল, অতি সহজ, তখন ইয়াশিনের পক্ষে অন্য ব্যবস্থাই বা কেন হইবে?

(১০)

রজনীর দ্বিযাম অতীত। ইয়াশিন, চোরের মত গুলনেয়ায়ের কক্ষের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

গুলনেয়ার তখনও ঘুমায় নাই। কেবলমাত্র চোখ দুটী বুজিয়া বিছানায় পড়িয়াছিল। তাহার কক্ষ দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত।

ইয়াশিন—ধীরে দ্বার ঠেলিয়া সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। এত ধীরে এত সন্তর্পণে সে ঘরের মধ্যে আসিল, যে গুল্ তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারিল না।

সে গুলনেয়ারের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিস্মিত ও পলকহীন নেত্রে, সেই অপূর্ব্ব রূপমাধুরী দেখিল! এলায়িত কেশপাশ, শুভ্র উপাধানের উপর পড়িয়াছে—উরসদেশ মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে। শুভ্র বাহুবল্লী তাহার মস্তকের নিম্নতলে ন্যস্ত। কি সুন্দর! আ মরি কি সুন্দর?

শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ইয়াশিন ডাকিল—"গুল্!"

সে আহ্বানে গুলের স্বল্পস্থায়ী তন্দ্রাটা তখনই ভাঙ্গিয়া গেল। সে চমকিতভাবে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল—"কে তুমি? ওঃ! ইয়াশিন! এত রাত্রে, গুপ্তভাবে আমার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছ কেন তুমি?

ইয়াশিন কাতরভাবে বলিল,—"তাহাও কি তুমি বুঝিতে পারিলে না গুল্?"

গুল্। না—তোমার এ ভাবে আগমন অসঙ্গত ও অন্যায়! কি মনে করিয়া এ গভীর নিশীথে তুমি এখানে আসিয়াছ ইয়াশিন?

ইয়াশিন। কেন আসিয়াছি, যখন নিজে তাহা বুঝিতে পারিলে না, তখন আমাকেই মুখ ফুটিয়া বলিতে হইবে। বুকের মধ্যে আর যে জ্বলন্ত অঙ্গার জ্বালা পুষিয়া রাখিতে পারি না।

গুল্। কিসের আগুন? কি বলিতেছ তুমি?

ইয়াশিন। হায় পাষাণী! এখনও তুমি আমার মনের কথা বুঝিলে না! আর কতদিন তুমি এ ভাবে দিন কাটাইবে? আর কতদিন তুমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিবে? তুমি যে দিন দিন আতপবিদগ্ধ পুষ্পের মত শুখাইয়া যাইতেছ গুল্। তোমার সম্মুখস্থিত ঐ উজ্জ্বল দর্পণ কি তোমায় বুঝাইয়া দেয় না—তুমি কি ছিলে আর কি হইয়াছ?

গুল্। তাহার জন্য তোমার অত ভাবনা কেন?

ইয়াশিন। আমি যে তোমায় ভালবাসিয়াছি গুল্! আমি যে তোমার রূপের আগুনে পুড়িতেছি গুল্।

গুল্। এখনই? এত শীঘ্র! এত বড় শয়তান তুমি, যে এখনই সেই দেবচরিত্র, অকপট চিত্ত একান্ত বিশ্বাসী সুহৃৎ কাশেমকে ভুলিলে? ছিঃ—ছিঃ—

ইয়াশিন। না—না, কৃতজ্ঞতা ভুলি নাই। তোমার রূপ দেখিয়া আমি মজিয়াছি, মরিয়াছি, ধিকি ধিকি তুষানলে দগ্ধ হইতেছি। আমি তোমায় পত্নীরূপে লাভ করিতে চাই! শাস্ত্রে বিধান আছে—আমি সেই বিধানের সহায়তায় তোমায় আমার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী করিতে চাই! হায় গুল্! কেন আমি তোমার পীড়ার সময় তোমার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিয়াছিলাম? কেন নির্ন্নিমেষ নেত্রে তোমার ঐ অপূর্ব্ব রূপমাধুরী দেখিয়াছিলাম?

গুল্‌নেয়ার তখন তাহার মনের কথা বুঝিল। সে এতক্ষণ শয্যায় বসিয়াছিল তখনই শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সিংহীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিল—"বটে! এত স্পর্দ্ধা তোমার! একবার সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখ দেখি?"

সম্মুখস্থ এক প্রশস্ত মর্ম্মর কুলুঙ্গীতে কাশেমের তৈলচিত্রখানি বিলম্বিত ছিল। সে চিত্র এত প্রস্ফুট, যে তাহা দেখিলে যেন বোধ হয়—জীবিত কাশেম সেই স্থানে বর্ত্তমান।

ইয়াশিন মুগ্ধের মত কক্ষের চারিদিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিল—"কি দেখিব গুল্?"

গুল্। আমার স্বামীকে! সেই পুণ্যব্রত, আশ্রিতবৎসল, সুহৃৎ হিতাকাঙ্ক্ষী, সরলবিশ্বাসী কাশেমকে—যিনি তোমার মত শয়তানকে এতটা বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

কাশেমের নামোল্লেখ শুনিয়া ইয়াশিন একটু ভয় পাইল। সে বলিল—"কোথায় কাশেম! সে ত মরিয়াছে!"

গুলনেয়ার দর্পিত স্বরে বলিল—"না—সে মরে নাই! সে আমার প্রাণের মধ্যে জীবিত। আমার চোখের সম্মুখে বর্ত্তমান। তাঁহার আত্মা ঐ চিত্রকে আশ্রয় করিয়াছে।

ইয়াশিন—সভয়ে একবার সেই পুষ্পমাল্য বেষ্টিত কাশেমের মূর্ত্তির দিকে চাহিল! তারপর আরও অগ্রসর হইয়া বলিল—"গুল্! তোমার মুখের একটী মাত্র কথা! বল তুমি আমাকে বিবাহ করিবে কি না?"

গুলনেয়ার, ইয়াশিনের এই কথায় অবজ্ঞা সূচক মৃদু হাস্যের সহিত বলিল, মানুষে অনেক সময়ে—না বুঝিতে পারিয়া ভয়ানক ভ্রম করে।

তুমি সেইরূপ একটা ভ্রমে পড়িয়াছ ইয়াশিন! তাহা না হইলে, মৃত পতিতেও একান্তানুরক্তা, কাশেম পত্নীর নিকট এ ঘৃণিত প্রস্তাব করিতে আসিবে কেন? এখনও ফিরিবার উপায় আছে। যাও—এখনি আমার এ পবিত্র কক্ষ হইতে। যে সোদরোপম বন্ধু তোমায় অগাধ বিশ্বাস করিত, যে সরল বিশ্বাসী তোমায় বিশ্বাস করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব তোমাকে দিয়া গিয়াছে—যে একান্ত বিশ্বাসে তাহার ধর্ম্ম পত্নীকে তোমার আশ্রয়ে রাখিয়া গিয়াছে—তাহার সেই গভীর বিশ্বাসের, স্নেহের, সৌভ্রাত্রের অমর্য্যাদা করিও না। এত শীঘ্র নেমকহারামি করিও না। ইহলোককেই জীবনের শেষ সীমা বলিয়া ভাবিও না। পরলোকের কথা একবার স্মরণ কর। যাও—এখান হইতে চলিয়া যাও।"

শয়তান তখন ইয়াশিনের স্কন্ধে আসিয়া চাপিল। সে একটু দৃঢ়তার স্বরে বলিল—"যতই বল না তুমি গুল্‌নেয়ার! আমি কিছুতেই আমার সংকল্প বিচ্যুত হইব না। জানিও—সে সদাশয় ইয়াশিন মরিয়াছে। এখন যে ইয়াশিন তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সে পাপের পূর্ণ অবতার! শয়তানের জাগ্রত প্রতিমূর্ত্তি! আমি নিজের স্বার্থ চাই, নিজের সুখ চাই। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, ইহকাল পরকাল, কিছুই দেখিতে চাই না। তোমাকে পাইবার জন্য—লজ্জা, কলঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা, সবই করিতে প্রস্তুত। আর আমায় নিষ্ঠুরভাবে নিপীড়িত করিও না! একবার আমাকে তোমার ঐ কোমল কর-পল্লব চুম্বন করিতে দাও!"

এই বলিয়া ইয়াশিন আরও একটু অগ্রসর হইল। গুল্—সভয়ে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

সে বুঝিল—তাহার আত্মরক্ষার ভার তাহার নিজের হাতে। তাহার

কক্ষমধ্যে, কোন গুপ্তস্থানে একখানি শানিত ছোরা লুকানো ছিল। গুল্‌নেয়ার বিদ্যুৎগতিতে সরিয়া গিয়া, সেই ছোরাখানি তুলিয়া লইল! বলিল—"সাহস থাকে অগ্রসর হও।"

সেই ভীষণ ছুরিকা দেখিয়া পুরুষাধম ইয়াশিন ভয় পাইল। সে রুষ্ট-স্বরে বলিল—"ভাল! তোমার সতীত্বের এই দর্প একদিন চূর্ণ করিব। একদিন তোমাকে এর জন্য চোখের জল ফেলিতে হইবে।"

আর কিছু না বলিয়া, পদাহত কুকুরের মত ইয়াশিন ধীরে ধীরে সেই স্থান ত্যাগ করিল।

রূপের লালসা—আর ভালবাসা এ দুইটী স্বতন্ত্র জিনিস। গুলের অপূর্ব্ব রূপমাধুরীই ইয়াশিনকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাকে অতি সহজে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া, তাহার এই শোচনীয় নিষ্ফলতা! এই অসহনীয় অপমান!

এ তীব্র অপমানটা তাহার বুকে বড়ই বাজিল। সে দন্তে দন্তে নিষ্পেষিত করিয়া বলিল—"থাক তুমি এই ভাবে! কিন্তু কতদিন থাকিবে? কিসে তুমি সুখে থাক এতদিন এই চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছি। অতঃপর কিসে তুমি অসুখী হও, এখন হইতে তাহারই চেষ্টা করিব। কিসে তুমি লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা হও, তাহার ব্যবস্থা আমি করিতেছি। কাশেমের পাওনাদারদের উত্তেজিত করিয়া আমি কাজির কাছে তোমার নামে নালিস্ করাইব—তোমাকে তোমার বাস্তুভিটা হইতে তাড়াইব—তোমার চরিত্রে কলঙ্কাপবাদ দিয়া তোমায় পথের ভিখারিণী করিব। তবে আমার নাম ইয়াশিন!"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার সহাধ্যায়ী মিত্র জাফর তাহার বড়ই অনুরাগী।

ইয়াশিন মনে মনে ভাবিল, যদি কেউ আমাকে এ সম্বন্ধে সমীচিন পরামর্শ দিতে পারে ত এই জাফর মহম্মদ।

সমস্ত রাত্রিটা নিদারুণ মর্ম্ম বেদনা আর প্রতিশোধের উপায় চিন্তায় কাটাইয়া, প্রভাত হইবার প্রারম্ভে সে জাফরের বাড়ীতে গেল।

জাফর পূর্ব্বরাত্রে খুব মদ্য পান করিয়াছিল। সুতরাং তখনও সে শয্যা হইতে উঠে নাই। ইয়াশিনের ডাকাডাকিতে সে একটু অপ্রসন্নচিত্তে অন্দর হইতে বাহির হইল।

সহসা সেই প্রভাতে ইয়াশিনকে তাহার বাড়ীতে সমুপস্থিত দেখিয়া জাফর কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল "সুপ্রভাত! দোস্ত! আজ কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম তা বলিতে পারি না। কেননা সকালেই তোমার মোলাকাৎ পাইলাম।"

কিন্তু অত প্রত্যূষে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার বাড়ীতে ইয়াশিনকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, সে মনে মনে প্রমাদ গণিল। সে ভাবিল, হয়তো ইয়াশিন তাহার প্রাপ্য টাকার তাগাদায় আসিয়াছে।

ইয়াশিন সর্ব্ব প্রথমে আলাপ সূচনা করিয়া তাহার ভয় ভঞ্জন করিয়া দিল। সে সহাস্য মুখে বলিল—"ভাই! তোমার সঙ্গে আমার খুব একটা কাজের কথা আছে। কিন্তু নানা কারণে ইতঃস্ততঃ করিতেছি, এখন তোমায় তাহা বলিতে পারি কি না?"

জাফর আত্মীয়তা দেখাইয়া বলিল—"আমায় বলিবে তার আবার সময় অসময় কি? আমি তোমার বান্দার বান্দা! তোমার মত উপকারী সদাশয় দোস্তের কথা শুনিতে আমি সকল সময়েই প্রস্তুত।"

ইয়াশিন সহাস্য মুখে বলিল—"তা এর জন্য তোমায় হাজার সেলাম

দিতেছি। তোমার মত সরল-হৃদয় আর এতটা সমর্পিতপ্রাণ দোস্ত মেলা খুব ভাগ্যের কথা। কিন্তু তোমার মুখ চোখের অবস্থা দেখিয়া বুঝিতেছি, কাল রাত্রে প্রাণ ভরিয়া সেরাজি খাইয়াছ। আমার কথাগুলা, শুনিবার ঠিক উপযুক্ত তুমি এখন কিনা, তাহাত বুঝিতে পারিতেছি না।”

জাফর সহাস্য মুখে বলিল—“এই সময়ই ঠিক সময়! এখন মগজটা খুব ঠাণ্ডা আছে।”

ইয়াশিন। ভাল—ভাল! এদিকে আর কেউ আসিবেনা ত?

জাফর। না—কেউ না। তবে এখনি চাকরটা আমার কফি লইয়া আসিবে। আমি তাহাকে বলিয়া দিই গে তোমার জন্যও এক পাত্র আনিতে।

জাফর ক্ষণকালের জন্য সেই স্থান ত্যাগ করিল। ইয়াশিন এই স্বল্পাবসরের মধ্যে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—ইহাকে আমার মনের কথা বলা উচিত কি না? সকল দিক দিয়া আলোচনার পর সে বুঝিল—না বলিয়াই বা করি কি? আমি কাল সারারাত ধরিয়া যে সাংঘাতিক মতলব স্থির করিয়াছি, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে, এইরূপ একটা চরিত্রহীন অর্থপিপাসু লোকের সহায়তার বিশেষ প্রয়োজন। এতদিন ইহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এখন ইহাকে আমার প্রয়োজন বলিয়া, সে ঘৃণা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এ আজন্ম বদমায়েস্ আর আমি কার্য্যক্ষেত্রে পড়িয়া এর চেয়েও ভীষণ শয়তান হইয়া দাঁড়াইয়াছি। লোকটা সম্পূর্ণরূপে আমার ক্ষমতার অধীন। অনেক টাকাকড়ি আমি ইহাকে ধার দিয়াছি। সে সমস্ত শোধ করিবার ক্ষমতা এর নাই। এর এখনও টাকার বড়ই প্রয়োজন। রূপেয়ার সহায়তায়

আমি গুল্‌নেয়ারের রূপের দর্প চূর্ণ করিব। এই কাণ্ডজ্ঞানহীন বর্ব্বর জাফরের সহায়তায়, আমি গুল্‌নেয়ারের সর্ব্বনাশ করিব।"

এই সময়ে জাফর নিজের হাতে দুই পেয়ালা কফি লইয়া, সেই বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—"যখন দয়া করিয়া এ গরীব-খানায় আসিয়াছ—তখন তোমায় একটু বেশী খাতির করা উচিত। তোমাকে সম্মান দেখাইবার বেশী কিছুই নাই। তাই নিজেই কাফি লইয়া আসিলাম। আর আমার চাকরটাকে, এই সকাল বেলাতেই এক লম্বা বাজারের ফর্দ্দ দিয়া পাঠাইয়াছি। তাহার ফিরিতে নিশ্চয়ই দুই ঘণ্টা বিলম্ব হইবে। এর মধ্যে তোমার কথাগুলি শেষ হইবে না কি?"

ইয়াশিন উঠিয়া দাঁড়াইয়া, তাহার বন্ধুর হাত হইতে কাফর পেয়ালা লইয়া বলিল—"বেশ করেছ! খুব বুদ্ধির কাজ করেছ দোস্ত! আমি এখন তোমাকে যে কথাগুলা বল্‌তে এসেছি, সে কথাগুলো অতি সাংঘাতিক। আমি এক মহা বিপদে পড়েছি, আর সে সম্বন্ধে প্রতিকার করবার জন্য একটা পরামর্শের জরুর প্রয়োজন। তোমার মগজটা খুব খেলে। অনেক রকম মতলব তোমার মাথায় আসে। আর তোমার মত বিশ্বাসী বন্ধুও আমার কেউ নেই। তুমি সদোর দরোজাটা একাবারে বন্ধ করে এস। বাস্‌—তাহলে কোন উৎপাতই ঘট্‌বে না।"

জাফর তখনই উঠিয়া গিয়া, সদর দরোজা বন্ধ করিয়া আসিয়া বলিল—"এইবার বল দেখি তোমার কথা? এস আমার এই নির্জ্জন কক্ষে।"

জাফর ধীরে ধীরে তাহার কক্ষের দ্বারটি ভেজাইয়া দিয়া বলিল—"এইবার তুমি সব কথাই নির্ব্বিঘ্নে বলিতে পার।"

ইয়াশিন বলিল—"তুমি ধর্ম্মশপথ প্রতিজ্ঞা কর, এখন যাহা তোমায় বলিব, তাহা আর কারুর কাছে প্রকাশ করিবে না।"

জাফর বলিল—"আমি নষ্টচরিত্র হইতে পারি, দুষ্ট বদমায়েস হইতে পারি, কিন্তু কখনও বন্ধুর সহিত বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্ক কিনি নাই। স্বচ্ছন্দে তুমি তোমার বিশ্বাস, আমার উপর ন্যস্ত করিতে পার।"

ইয়াশিন বলিল—"কাশেমের পত্নী গুলের নাম শুনিয়াছ ত?"

জাফর। অনেক বার!

ইয়াশিন। কাশেম যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য রাখিয়া গিয়াছে। আর তার উপর রাখিয়া গিয়াছে—এই সুন্দরী পত্নী!

জাফর। কাশেমের মৃত্যুসংবাদ সে দিন ত তোমার মুখেই শুনিয়াছি। কিন্তু সে সংবাদ ভিত্তিহীন নয় ত?

ইয়াশিন। কখনই না। তার নিঃসন্দেহ প্রমাণ আমার কাছে।

জাফর। বল, আমায় কি করিতে হইবে?

ইয়াশিন। ক্রমে বলিতেছি। দেখ, কোন কারণে আমার সন্দেহ হইয়াছে, যে কাশেম-পত্নী এই গুলনেয়ার, বোধ হয় শীঘ্রই তাহার গুপ্ত প্রেমপাত্রকে বিবাহ করিবে। লোকটা যে কে—ধরিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু পারিতেছি না।

জাফর। বল কি এমন ব্যাপার! কি করিয়া জানিলে তুমি?

ইয়াশিন। না জানিয়া অবশ্য আমি এক সম্ভ্রান্ত কুলস্ত্রীর নামে বৃথা অপবাদ দিতেছি না। কিন্তু গুলনেয়ারের এই প্রেমপাত্রটী যে কে, তাহার সন্ধান এখনও পাই নাই। যাক্—তোমাকে সব কথাই বলিয়া ফেলি। পাছে গুলনেয়ার বিপথগামিনী হয়, অপরের করে আত্ম সমর্পণ করে, এই জন্য

আমি তাহার নিকট বিবাহ প্রস্তাব করি। আমার মৃত বন্ধুর পত্নী আমারই পত্নী হয়, ইহাই আমার মনের ইচ্ছা।

জাফর। তারপর?

ইয়াশিন। তারপর আমার মুখে এই প্রস্তাব শুনিয়া, গুল্‌নেয়ার আমায় যথেচ্ছা গালাগালি দিয়াছে, এমন কি পদাঘাত পর্য্যন্ত করিয়াছে। কাশেমের মুখ চাহিয়া, আমি গালাগালিগুলা না হয় হজম করিতে পারি, কিন্তু এই পদাঘাতের অপমানটা আমার প্রাণে বড়ই বাজিয়াছে।

জাফর। আর—তুমি এজন্য প্রতিশোধ লইতে চাও? এই ত?

ইয়াশিন। না—সামান্য ক্ষমতাহীনা স্ত্রীলোক সে! কাশেমের কৃতোপকার এখনও ভুলিতে পারি নাই বলিয়াই, আমি নীরবে এ অপমান সহ্য করিতেছি। তবে তাহার ছলনাময় সতীত্বের দর্প ও তেজটা চূর্ণ করিতে চাই! আমি যখন তাহাকে পাইলাম না, তখন আর কেহ যাহাতে তাহাকে না পায়, তার চেষ্টা আমাকে করিতেই হইবে।

জাফর। তাহা হইলে তুমি গুল্‌কে গুম্ করিতে ইচ্ছা কর নাকি?

ইয়াশিন। না—আমি চাই, প্রতিবাসীদের সমক্ষে প্রমাণ করিতে, যে সে নষ্টচরিত্রা। তাহা হইলে সামাজিক বিধানে, আর কেহই তাহাকে প্রকাশ্যে বিবাহ করিতে সাহস করিবে না। এরূপে আমারও প্রতিশোধ লওয়া হইবে। আর সত্য কথা বলিতে কি দোস্ত! ঐ গুল্‌নেয়ারের সৌন্দর্য্য আমার মগজটাকে বড়ই বিগড়াইয়া দিয়াছে। যখন সে দেখিবে, এই সামাজিক কলঙ্কের জন্য অপরে তাহাকে বিবাহ করিতে নারাজ—তখন সে নিরুপায় হইয়া আমারই শরণাগত হইবে। ইহাতেই তাহার সতীত্বের দর্প চূর্ণ হইবে। আর একটা কথা হইতেছে এই, কাশেমের মৃত্যুর দুই মাসের

মধ্যে, আমি বর্ত্তমানে সে যে অপরের হাতে গিয়া পড়িবে, এটাও আমার ইচ্ছা নয়।”

জাফর বলিল—“তা আমাকে এ ব্যাপারে কি সাহায্য করিতে হইবে?”

ইয়াশিন তাহার জামার জেব হইতে একটী ক্ষুদ্র থলিয়া বাহির করিয়া বলিল—“এই থলিতে এক শত স্বর্ণ মুদ্রা আছে। তুমি এখনই ইহা বায়না স্বরূপ লও। আর এ কাজটা ভালয় ভালয় হইয়া গেলে, আরও এক শত স্বর্ণমুদ্রা আমি তোমাকে দিব। কি কাজটা তোমায় করিতে হইবে, তাহা একটু পরে বলিতেছি।

জাফর বুঝিল, সেদিন তাহার অতি সুপ্রভাত। তাহার হাতে একটী পয়সাও তখন নাই, অথচ খরচ অনেক। সেও কাণ্ডজ্ঞানহীন ঘোর পাপিষ্ঠ। কাজেই সে বলিল—“বল, আমায় কি করিতে হইবে?”

ইয়াশিন একটা ঢোঁক গিলিয়া, অতি সহজভাবে বলিল—“এমন বেশী কাজ, কিম্বা শক্ত ব্যাপার কিছুই নয়। তোমাকে কাল রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে তাহার বাড়ীতে লুকাইয়া থাকিতে হইবে। সে সম্বন্ধে বন্দোবস্ত আমিই করিয়া দিব। তার পর আমি যখন বাহির হইতে একটা সোরগোল উপস্থিত করিব—তখন তুমি তাড়াতাড়ি তার পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া পলাইয়া যাইবে। অবশ্য সে সময়ে যাহারা উপস্থিত থাকিবে, তাহারা আমারই অনুগত লোক। তোমার ধরা পড়িবার কোন ভয়ই নাই। জান তো আমাদের এই সুলতানের রাজ্যে, নারীর ব্যভিচারের দণ্ড অতি কঠোর! অতি সহজেই আমি এই উপায়ে সকল দিক দিয়া এই দর্পিতা গুলনেয়ারকে জব্দ করিতে পারিব। তাহাকে এই বিপদে ফেলিলে সে নিশ্চয়ই আমার শরণাগত হইবে। কাজির সহিত আমার খুব আলাপ আছে। যাহাতে

এ ব্যাপারটা গোপনে গোপনে মিটাইতে পারি, তার চেষ্টা করিয়া এই গুল্‌নেয়ারকে কৌশলে হাত করিব।

জাফর ঘোর শয়তান হইলেও, তাহার বন্ধুর এই সাংঘাতিক মতলবের কথা শুনিয়া বড়ই ভয় পাইল! কিন্তু টাকার তাহার বড়ই অভাব। একজন রূপের প্রভাবে উন্মাদ হইয়া এই ভীষণ দুষ্কর্ম্মে রত হইতেছে, আর এক জন যে রূপেয়ার জন্য তাহার সে দুষ্কর্ম্মের সহায়তা করিবে না, তাহারই বা অসম্ভাবনা কই? তবুও সে বলিল—"তোমার মত উপকারী বন্ধুর মুখ চাহিয়া এই ভয়ানক পাপে লিপ্ত হইতেছি। দেখিও—ভাই! শেষ যেন আমাকে না ধরা পড়িয়া গারদে পচিতে হয়।"

ইয়াশিন বিরক্তির সহিত বলিল—"দেখ! পাপ অপাপ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, এ সব নিক্তির ওজনে বিচার করিয়া চলিতে গেলে, এ দুনিয়ায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাটা খুবই কঠোর হইয়া পড়ে। ও সব কথা ছাড়িয়া দাও! যে স্ত্রীলোক আজ না হয় দুই দিন পরে স্বেচ্ছায় পাপের পথে দাঁড়াইবে, তাহাকে এইরূপ কৌশলে নিরস্ত করাও কি একটা ধর্ম্মের কাজ নয়?"

তখন স্বল্পক্ষণ ব্যাপী নানাবিধ তর্কবিতর্কের পর, উভয় বন্ধুর মধ্যে এ সম্বন্ধে একটা শেষ পরামর্শ স্থির হইয়া গেল!

(১১)

ইহার পর দিনই এই সাংঘাতিক প্রতিহিংসার ব্যাপার কার্য্যে পরিণত করা হইল। এ ভীষণ কার্য্যের অন্যতম সহায় সুরিয়া বাঁদী! শয়তান ইয়াশিন যে উপায়ে জাফরকে আয়ত্ত্বাধীন করিয়াছিল, সেই অর্থ সহায়তায় সুরিয়াকেও হস্তগত করিল।

কোন শয়তান প্রকৃতির লোক, যখন কোন একটা দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে চারিদিকে সুন্দররূপে আটঘাট না বাঁধিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামে না। সুতরাং ইয়াশিন—এই সুরিয়ার সহায়তায়, উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া তাহার দোস্ত জাফরকে, কাশেমের অন্দর মধ্যে গুপ্তভাবে প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

গুল্ যে ঘরে শয়ন করিত, তাহার পার্শ্বে আর একটী কক্ষ। গুলের ও এই কক্ষের মধ্যে একটীমাত্র দ্বার। সেই অর্গলটী খুলিলে সহজেই গুলের কক্ষে প্রবেশ করা যায়। বলা বাহুল্য, সুরিয়ার সুব্যবস্থায় জাফর এই পরিত্যক্ত কক্ষ মধ্যে আত্মগোপনের বিশেষ সুবিধাই পাইল।

ইয়াশিন তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল—"যে কক্ষে তুমি লুকাইয়া থাকিবে, সে স্থান হইতে রাজপথ অতি নিকটে। ঠিক রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়, যখন পথে ঘাটে লোকজন থাকিবে না, সেই সময়ে আমি একটী বাঁশীর আওয়াজ করিব। সেই আওয়াজ শুনিলে তুমি বুঝিবে, আমরা কাশেমের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছি।"

এদিকে অভাগিনী গুল্ জানে না—যে তাহার সর্ব্বনাশের জন্য কি এক ভীষণ চক্রান্তের অনুষ্ঠান হইয়াছে। তাহার পার্শ্বের কক্ষেই তাহার সাংঘাতিক শত্রু গুপ্তভাবে লুকাইয়া আছে।

সহসা পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে লুক্কায়িত জাফরের কাণে, সেই গভীর নিশীথে রাজপথ হইতে একটা বাঁশীর আওয়াজ পৌছিল। রাত্রি তখন ঠিক এক প্রহর।

সেই শব্দ শুনিবামাত্রই, জাফরের প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। সে মনে ভাবিল, আর একটু পরে সে যে সাংঘাতিক ব্যাপারের অভিনয়

করিবে, তাহাতে এক নিরীহা নিরপরাধিনী অবলার সর্ব্বনাশ হইবে। হায়! কেন সে এ ভীষণ ব্যাপারে লিপ্ত হইল?

সে একবার ভাবিল—"কাজ নাই এ ঝঞ্ঝাটে! সামান্য অর্থের জন্য এত বড় একটা পাপ কাজ করা কেন? জানালা দিয়া না হয় লাফাইয়া পড়িয়া পলাইয়া যাই।

আবার তথনই ইয়াশিনের শাসন বাক্য তাহার মনে হইল। সেই দিন সন্ধ্যার সময়—ইয়াশিন তাহার হাতে আরও একশত টাকা দিয়া বলিয়াছিল—"তুমি আমার কাছে দুই হাজার টাকার ঋণপত্র আগে লিখিয়া দিয়াছ, একথা মনে আছে ত? এই টাকা খাইয়া যদি কোন কারণে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া আমার কাজ নষ্ট কর—জানিও তাহা হইলে তোমার নিস্তার নাই। আগেকার ঋণের দায়ে তোমাকে কারাগারে পচিতে হইবে।

ভবিষ্যতের এই সব ভাবনা ভাবিয়া, জাফরের আর নড়িবার চড়িবার শক্তি রহিল না। সে যাহা করিবার জন্য, সেই কক্ষ মধ্যে গুপ্তভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার উপযুক্ত অবসর অপেক্ষায় স্থিরভাবে চোরের মত তন্মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল।

এদিকে অভাগিনী গুল্‌নেয়ার নিশ্চিন্ত চিত্তে শয্যায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে। তাহার সর্ব্বনাশের জন্য যে এত কাণ্ড করা হইয়াছে, তাহার কিছুমাত্র সে জানিতে পারে নাই। আর তাহার শয়নকক্ষের পার্শ্বেই যে তাহার অতি সাংঘাতিক শত্রু লুকাইয়া আছে, তাহাও তাহার অপরিজ্ঞাত।

এমন সময়ে কে যেন তাহার কক্ষ দ্বারে সবলে আঘাত করিয়া ডাকিল—"গুল্! গুল্‌নেয়ার!"

এই আঘাত শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে তন্দ্রালসনেত্রে বলিল—"কে তুমি?"

বাহির হইতে ইয়াশিন বলিল—"একবার দ্বার খুলিয়া দাও। বিশেষ সংবাদ আছে। কাশেমের সম্বন্ধে?"

গুল্‌নেয়ার ইয়াশিনের কণ্ঠস্বর শুনিয়া মনে মনে ভাবিল—"দ্বার খুলিব কি না?" কিন্তু—"কাশেমের কোন সংবাদ আছে" এই কথাটা শুনিয়া সে বড়ই অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। সে অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল—"ইয়ে মেরে খোদা মেহেরবান্! তবে কি আমার কাশেম এখনও প্রাণে বাঁচিয়া আছে?"

সে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শয্যা হইতে উঠিয়া, নিদ্রালসনেত্রে দ্বার খুলিয়া ফেলিল। কক্ষ মধ্যে একটীমাত্র দীপ জ্বলিতেছে। সেজন্য কক্ষটী পূর্ণভাবে আলোকিত হয় নাই।

ইয়াশিন সেই অন্ধকারের মধ্যে, গুল্‌নেয়ারের দিকে এক দর্পমিশ্রিত উল্লাসময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"ভাল কথা গুল্‌নেয়ার! কাশেম কি আজ গুপ্তভাবে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছে?"

গুল্, ইয়াশিনের এ অসম্ভব কথায় বড়ই বিস্মিত হইয়া বলিল—"কি বলিতেছ—তুমি ইয়াশিন! উন্মাদ নাকি তুমি? এত রাত্রে তুমি কি এই অদ্ভুত খেয়াল লইয়া, আমার সহিত রহস্য করিতে আসিয়াছ?"

ইয়াশিন দৃঢ় স্বরে বলিল—"রহস্য নয় গুল্‌নেয়ার! প্রত্যক্ষ সত্য। আজ কোন বন্ধুর বাড়ীতে একটা জল্‌সা ছিল। একটু বেশী রাত্রে জল্‌সা ভাঙ্গিয়া যায়। যখন আমি বাড়ী ফিরিতেছি, তখন দেখিলাম, যে আপাদ মস্তক বস্ত্রাবৃত, কাশেমের মত দীর্ঘকায়কে একজন তোমাদের বাড়ীর খিড়কীর

দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি, বাঁদী দরোজা খুলিয়া দিবার পর, সে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সে যে কাশেম—তার আর কোন সন্দেহই নাই। তাকে দেখিবার জন্য, আমি বাড়ী না গিয়া সরাসর এখানে আসিয়াছি।”

গুল্‌নেয়ার বিস্মিতভাবে ইয়াশিনের মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর কক্ষের চারিদিকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—“বল কি? অতি তাজ্জব কথা যে তুমি বলিতেছ!”

ইয়াশিন পিশাচের মত কঠোর হাস্য করিয়া বলিল—“ওঃ! এখন সব বুঝিতে পারিতেছি। কাশেমের অনুপস্থিতিতে সবই ঘটা সম্ভব। আমি এটুকুও বলিতে পারি, যে লোক এই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সে এই বাড়ীর ভিতরে নিশ্চয়ই কোথাও লুকাইয়া আছে। কারণ আমি সেই খিড়কীর দ্বারের কাছে আসিবামাত্রই, দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। বাড়ীর সদর দরজা খুলাইয়া তবে আমরা ভিতরে আসিয়াছি।”

গুল্‌নেয়ার ইয়াশিনের মুখের দিকে সভীত নয়নে চাহিয়া বলিল—“ব্যাপার কি ইয়াশিন! কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না।”

ঠিক এই সময়ে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া জাফর, গুল্‌নেয়ারের কক্ষের উন্মুক্ত দ্বারের মধ্য দিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

ইয়াশিন বলিল—“ঐ পলায়! ঐ সেই শয়তান পলায়! ঐ হতভাগাই আমার—বন্ধুপত্নীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে।”

দ্বারের অদূরে দুইজন প্রতিবাসী দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা সেই লোকটাকে পলাইতে দেখিল, কিন্তু কোনরূপ বাধা দিল না। তাহারা মনে মনে হয়ত ভাবিয়াছিল—“কে যায় বাবা! অত হাঙ্গামে। ব্যাটা কি ছোরা

ছুরি না লইয়া একটা বড় লোকের অন্তঃপুরে গুপ্তপ্রেম করিতে আসিয়াছে ?”

তাহাদের নিশ্চিন্তভাবে থাকিতে দেখিয়া, ইয়াশিন বলিল—“ধর—ধর অই ব্যাটাকে।”

সেই দুইজন প্রতিবাসী বলিল—“আগে একটা আলো লইয়া আইস ইয়াশিন! এ বাড়ীর কোন দিকে কি আছে তাহাত আমরা জানিনা!”

ইয়াশিনের শিক্ষা মতে, সুরিয়া খিড়কী দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছিল। জাফর সেই দ্বার পথেই নিরাপদে পলাইল।

ইয়াশিন সুরিয়াকে একটা বাতি আনিতে বলিল। তারপর পূর্ব্বোক্ত দুইজন প্রতিবাসীকে সঙ্গে করিয়া, গুল্‌নেয়ারের পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ করিল। দেখিল—সেই কক্ষ মধ্যে একটী কৃষ্ণবর্ণের গাত্রাচ্ছাদনী পড়িয়া আছে। ইহাও ইয়াশিনের উপদেশের ফল!

ইয়াশিন পোষাকটী সংগ্রহ করিয়া নীচে আসিয়া, বাটীর চারিদিক খুঁজিল। কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। তারপর উপর তলে আসিয়া সুরিয়াকে ধমক্ দিয়া বলিল—“সত্য বল্ শয়তানী! কাহাকে তুই দ্বার খুলিয়া দিয়াছিস্?”

সুরিয়া চোখে বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া, ক্রন্দনের ভাণ দেখাইয়া বলিল—“সাহেব! এ সম্বন্ধে কোন কথাই আমি বলিব না। আপনারা যদি আমায় হত্যা করেন—তাহা হইলেও না। হায়রে কপাল! এমন সাংঘাতিক জায়গাতেও চাকরী করিতে আসিয়াছিলাম?”

ইয়াশিন কৃত্রিম কোপের সহিত বলিল—“যা! তুই এখনি এ বাড়ী হইতে দূর হইয়া যা। কাল সকালে আমি নূতন লোক বন্দোবস্ত করিব।

নিমক-হারাম শয়তানী কোথাকার! আমি তোকে কাজির কাছে হাজির করাইয়া দেখিব, তুই মারের চোটে সত্য কথা বলিস্ কিনা?"

মুরিয়া সেই ভাবে চোখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে—সেই বাটী ত্যাগ করিল।

গুলনেয়ার দুই জন অপরিচিত লোককে সেখানে দেখিয়া, অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া আছে। সে—কোন কথাই বলিতেছে না। কিন্তু হায়! হতভাগিনী যদি এ সময়ে আত্মপক্ষ সমর্থনার্থে দুই চারিটা কথাও বলিত, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহার অতি শোচনীয় পরিণাম ঘটিত না।

ইয়াশিন সেই দুইজন প্রতিবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"মহাশয়গণ! ব্যাপার যা—তাহা ত স্বচক্ষে দেখিলেন! আমার সোদর তুল্য বন্ধু কাশেম, মোটে দুই মাস ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছে। এরি মধ্যে তাঁর পত্নীর এই ব্যবহার! অতি দুর্ভাগ্য আমার, যে স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখিতে হইল! আমার প্রাণের মধ্যে কি যে ভয়ানক জ্বালা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না! হায় কাশেম! কোথায় তুমি! তুমি যে এই কলঙ্কিনীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমাকে দিয়া গিয়াছিলে। আমি যে এই বিশ্বাসঘাতিনী সর্ব্বনাশিনী নারীকে, চিরদিনই সোদরা জ্ঞানে পূজা করিয়া আসিয়াছি। এত শীঘ্র যে তাহার এ অধঃপতন ঘটিবে, প্রলোভনে পড়িয়া এ মহাপাপে লিপ্ত হইবে, স্বপ্নেও একথা ভাবি নাই। ভাগ্যে আপনারা কাশেমের অপ্রত্যাশিত আগমন সংবাদে কৌতুহলী হইয়া, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন! যাই হোক, এই বিশ্বাসঘাতিনীর মহাপাপের প্রতিফল আমিই ইহাকে দিব। কালই আমি কাজির নিকট নালিশবন্দী হইব। হায়! কাশেম

ইহার প্রকৃত চরিত্র জানিতে পারিয়াই, আমায় বহুপূর্ব্বে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল।”

ইয়াশিন আর কিছু না বলিয়া, সেই কক্ষের কুলুঙ্গির ভিতর হইতে একটী তালা লইয়া বলিল—“সদর দ্বারে এই চাবি দিয়া, চলুন আমরা চলিয়া যাই। আজ রাত্রের মত ঐ শয়তানী এ বাড়ীতেই থাক। আমার প্রিয়বন্ধু কাশেমের পরিত্যক্ত অগাধ সম্পত্তি কখনই এই চরিত্রভ্রষ্টার ভোগ্য নহে। কাল কাজি সাহেবের বিচারে যাহা হয় হইবে।”

এই কথা বলিয়া ইয়াশিন পূর্ব্বোক্ত দুইজন প্রতিবাসীকে লইয়া সেই বাড়ী হইতে চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য, সে যাইবার সময় সদর দ্বারে চাবি লাগাইতে ভুলিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাশেমের বাড়ীর পার্শ্বেই তাহার বাড়ী। সে সেই দুইজন প্রতিবাসীকে বিদায় দিয়া, উল্লাসিত চিত্তে নিজের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিল—জাফর তাহার জন্য সেই কক্ষে অপেক্ষা করিতেছে।

জাফর তাহাকে দেখিয়া মলিন মুখে বলিল—“তুমি ফিরিয়া আসিয়াছ আঃ—বাঁচিলাম। ব্যাপারটা আর বেশী দুর গড়ায় নাই ত? তোমার প্রতিবাসীরা আমায় চিনিতে পারে নাই ত দোস্ত!”

ইয়াশিন জাফরের পিঠ চাপড়াইয়া মুরুব্বিয়ানার সুরে বলিল “আরে—না, না, এমন কাঁচা কাজ আমি করি না। মোদ্দা, তোমারও বাহাদুরী আছে। এই নাও আরও কিছু টাকা।”

জাফর তাহার অতি ঘৃণিত, পাপলব্ধ মুদ্রাগুলি লইয়া সে স্থান হইতে বিষণ্নমুখে প্রস্থান করিল।

আর অভাগিনী গুলনেয়ার! সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না—যে

কিসে কি হইল? সে একবার মনে ভাবিল হয়ত এটা বিকট স্বপ্ন? তারপর ভাবিল, না—না এতো স্বপ্ন নয়। এ যে অতি প্রত্যক্ষ ঘটনা। সেই শয়তান ইয়াশিন তাহার পাপবাসনা সহজ চেষ্টায় চরিতার্থ করিতে না পারিয়া, এক ভীষণ চক্রান্ত জাল বিস্তারে তাহার চরম সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

সে কিয়ৎক্ষণমাত্র মুগ্ধ অবস্থায় থাকিয়া, একটু স্থিরভাবে চিন্তার অবসর পাইল। ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনাগুলি মনে মনে আলোচনা করিয়া বুঝিল, এই শয়তান ইয়াশিন না করিতে পারে—এমন কাজই নাই। সে এমন একটা চতুরতার সহিত এই ঘৃণিত ঘটনাচক্র সৃষ্টি করিয়াছে—যে সকল প্রমাণই এখন তাহার বিরুদ্ধে। এ বাটীতে আর তাহার স্থান নাই। এ নগরে আর তাহার মুখ দেখাইবার উপায় নাই!

সে মাটীতে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। আকুলস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল—"শয়তান ইয়াশিন! কেন আমার এ সর্ব্বনাশ করিলি? এ সংসারে আমার দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত রাখিলি না?"

(১২)

ঘটনা স্রোতে কেহ কখনও বাধা দিতে পারে না। অদৃষ্টে যে কষ্ট ভোগের অদৃশ্য লিপি, কর্ম্মফল নিজের হাতে লিখিয়া দিয়াছে, তাহারও দাগ কেহ চেষ্টা করিয়া মুছিতে পারে না।

সুতরাং নানাবিধ অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত ঘটনাচক্রে পেষিত হইয়া, অভাগিনী গুলনেয়ারের অদৃষ্টে যাহা ঘটিল—তাহা অতি শোচনীয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানুষের মধ্যে শয়তান ও দেবতা দুই আছে। তাহার মনে পাপ ও পুণ্য উভয় প্রবৃত্তিই আছে। অনুকূল বা প্রতিকূল

ঘটনাচক্রে যেটা যখন তাহার মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে, তখন মোহাচ্ছন্ন মানব তাহারই অধীন হয়।

মানুষের মনের মত ক্ষণপরিবর্ত্তনীয় গুণসম্পন্ন, কোন কিছু বোধ হয় এ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। যে একটু আগে একান্ত সুহৃৎ ছিল, সে পরক্ষণেই ঘটনার ফেরে হয় ত মহা শক্রতে পরিণত হয়। যে একান্ত বিশ্বাসী সে দারুণ বিশ্বাসঘাতক হয়। যে দেবতা ছিল সে শয়তান হয়। যে মানুষ ছিল সে পশু হয়।

ইয়াশিনেরও তাই ঘটিয়াছে। এক রূপের মোহই তাহার ধ্বংসসাধনের সূচনা করিল। তাহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি, কৃতজ্ঞতা, চিত্তের সারল্য, কর্ত্তব্যে দৃঢ়তা, বিবেকের প্রাখর্য্য, সবই এই এক পঙ্কিল ব্যাপারে কলাঙ্কত হইয়া পড়িল। এ সর্ব্বনাশ, এ অধঃপতন, এ বিশ্বাসঘাতকতার প্রবৃত্তি, তাহার ঘটিত না, যদি সে গুল্‌নেয়ারের সেই সাংঘাতিক রোগের সময় উপরি উপরি কয়েক দিন ধরিয়া তাহার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া সেবা না করিত। কিন্তু ইহা যে তাহার ভবিতব্যের সৃষ্টি—সে সৃষ্টির ব্যর্থতা ঘটায় কে?

ইয়াশিনের অন্যান্য অনেক গুণ থাকিলেও, প্রকৃতি তাহার হৃদয়ে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিটা যেন একটু প্রখর করিয়া দিয়াছিলেন। এজন্য অভাগিনী গুল্‌নেয়ারের উপর সে যখন প্রতিশোধ লইবার কল্পনা করিল, তখন এই প্রতিশোধের চরম যাহা, অতি শোচনীয় অংশ যাহা, তাহাই সে করিয়া ফেলিল। তাহার প্রাণ একটুও কাঁপিল না, হৃদয় একটুও দমিল না। সে তখন পাষাণের চেয়েও পাষাণ! নরঘাতী হিংস্র শ্বাপদের চেয়েও অতি ভীষণ।

বসোরার রাজতন্ত্রে, বহুকাল প্রচলিত বিধানে, ব্যভিচারিণীর চরম শাস্তি

হইতেছে, প্রোথিত অবস্থায় প্রাণদণ্ড কিম্বা আজীবন নির্জ্জন কারাবাস। কাজি বা বিচারক, এই দুইটী দণ্ডের মধ্যে যেটি তাঁহার ইচ্ছা হয়, অপরাধের গুরুত্ব ও ঘটনাক্ষেত্র বুঝিয়া, তাহাই দিতে পারেন। আর এই কাজিই সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার ও বিচারক্ষেত্রে সুলতানের প্রতিনিধি।

গুল্‌নেয়ারের বিরুদ্ধে সাক্ষী অনেক। প্রথম সাক্ষী—ধাত্রী সুরিয়া। দ্বিতীয় সেই দুই জন প্রতিবাসী। তৃতীয়—গুল্‌নেয়ারের ঘোর মর্ম্মযাতনা-সম্ভূত নির্ব্বাক্ অবস্থা ও তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করা সম্বন্ধে নিশ্চেষ্টতা।

এই সব সাক্ষীর সহায়তায়, তাহার বিরুদ্ধে ব্যভিচার অপরাধ অতি সহজেই প্রমাণিত হইল।

যে কাজি সাহেব, গুল্‌নেয়ারের বিচার করিতেছিলেন, তিনি সুদূর অতীতে, একদিন এই গুল্‌নেয়ারের পিতার নিকট তাহার হস্তপ্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু গুল্‌নেয়ারের পিতা, প্রৌঢ়বয়স্ক ও স্বল্পবিত্ত সম্পন্ন এই কাজির প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া, সুকান্তিময়, সুন্দর স্বভাব, প্রচুর বিত্তের অধিকারী, কাশেমের সহিত কন্যার বিবাহ দেন।

সে বহু দিনের কথা। কাজি সাহেব এই উপেক্ষাজনিত অপমানটা মনের মধ্যেই এতদিন চাপিয়া রাখিয়াছিলেন—এমন কি প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। এখন গুল্‌নেয়ারকে ব্যভিচার অপরাধে অভিযুক্তা হইতে দেখিয়া, তিনি মনে মনে বড়ই একটা আনন্দ অনুভব করিলেন।

ইচ্ছা করিলে তিনি লঘু দণ্ড অর্থাৎ কারাবাসের দণ্ডটাই তাহাকে দিতে পারিতেন। কিন্তু অভাগিনী গুল্‌নেয়ারের অতি দুর্ভাগ্য, যে বসোরা সহরে অন্য একজন কাজি থাকিলেও, সে তাঁহারই নিকট বিচারার্থে আনীত হইয়াছিল।

দণ্ডাদেশ প্রদানের পূর্ব্বে তিনি যেন গুল্‌নেয়ারকে চেনেন না, এইরূপ

একটা ভাব দেখাইয়া বলিলেন—"আওরত্ ! তোমার বিরুদ্ধে যে গাওয়া পাইয়াছি, তাহাই তোমার অপরাধ প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট ! এখন আত্মপক্ষ সমর্থনের হিসাবে তোমার কিছু বলিবার আছে ?"

গুল্‌নেয়ার অৰ্দ্ধাবগুণ্ঠিতা। সে তখন কাঁদিতেছে। তাহার বুকের ভিতর একটা ভীষণ ঝড় বহিতেছে। তাহার হৃদয়াধিকার করিয়া তখন এমন একটা মহা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে—যে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোন কথাই সে বলিতেই পারিল না। কাজিকে দেখিবামাত্রই, সে চিনিতে পারিয়াছিল। তাঁহার কাছে যে কোন সুবিচার পাইবার আশা সুদূর পরাহত, তাহাও সে বুঝিল। সুতরাং এক্ষেত্রে সে মৌনাবলম্বনই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছিল। আর এ অযথা কলঙ্ক কালী মুখে মাখিয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা, মৃত্যুই যে তখন তাহার পক্ষে সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ, তাহাও সে উপলব্ধি করিয়াছিল।

সে মনে মনে কেবলমাত্র বলিল—"খোদা সাক্ষী! আমি দোষী কি না ? এ কলঙ্ক লইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা, মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ। এক ভীষণ চক্রান্তের ফলে যে কলঙ্ক একবার প্রচারিত হইয়াছে, তাহা মুছিয়া ফেলিবার শক্তি আমার মত সামান্যা নারীর নাই। এই শয়তান ইয়াশিন যে আমার স্বামীর পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ ও তাহার কলুষিত আশাভঙ্গের লাঞ্ছনার প্রতিশোধ লইবার জন্য, অতি কৌশলে এই নারকীয় ঘটনাজালের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বুঝিতেও আমার বাকি নাই।" এই সব ভাবিয়া সে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোন কথাই বলিল না।

তাহার এই নির্ব্বাক অবস্থা দেখিয়া সেই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন বিচারক, ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"রমণী! তুমি এক মহাপরাধে অপরাধিনী। এ

রাজ্যের বিধানে, ব্যভিচারিণীর চরম দণ্ড—প্রাণ দণ্ড। এর পূর্ব্বে আমি এরূপ বহু দণ্ডই আমার কঠোর কর্ত্তব্য সূত্রে দিয়াছি। যদি কোন কারণে আমাদের সুলতানের নিকট তোমার এ অপরাধের বিচার হইত, তাহা হইলে জানিনা, তোমায় আমি যে দণ্ড দিতেছি, তাহা কতই ভীষণ ভাবে দেওয়া হইত। কারণ অন্যবিধ অপরাধ মার্জ্জনা যোগ্য হইলেও, আমাদের সুলতান, রমণীর চরিত্রহীনতার দণ্ড অতি কঠোরভাবেই দিয়া থাকেন। রাজ্যের চির প্রচলিত বিধানে তোমাকে ভূমিমধ্যে জীবন্ত প্রোথিত করিয়া হত্যা করা হইবে।"

(১৩)

সমস্ত আদালত, এই ভীষণ দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। অবশ্য সে কক্ষ মধ্যে বেশী জনতা ছিল না। কেবল বিচারক ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ, আর বাদী প্রতিবাদীর দল। তাহাদের সকলেই এমন কি ইয়াশিন পর্য্যন্ত, এই ভীষণ দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া উঠিল।

ইয়াশিন কল্পনাতেও ভাবে নাই, যে এই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ কাজি সাহেব, এক অভাগিনী নারীর প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর দণ্ডাজ্ঞা করিবেন। সে ভাবিয়াছিল, হয় সে কলঙ্কিনী নাম কিনিয়া মুক্তি পাইবে, না হয় কিছু দিনের জন্য তাহার কারাবাস ঘটিবে।

ইয়াশিন মনে মনে এজন্য বড়ই অনুতপ্ত হইয়া বলিল—"হায়! কি করিলাম? কি [illegible]তে কি ঘটিল!"

মধ্যাহ্নে বিচার শেষ হইয়া গেল। দুইজন ভীষণ দর্শন, আরব জাতীয় প্রহরী আসিয়া, গুল্‌নেয়ারকে এক নির্জ্জন কারাগৃহে আবদ্ধ করিল।

সেইদিন সূর্য্যাস্তের পর রাত্রি আসিলে, সেই রজনীর মধ্য যামে, লোক-লোচনের অন্তরালে, এই ভীষণ কারাদণ্ড কার্য্যে পরিণত করা হইবে।

নির্জ্জন কারাকক্ষে বসিয়া গুল্‌নেয়ার অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল। সে মনে মনে বুঝিল, তাহাকে পত্নীরূপে লাভ করিতে না পারিয়াই, শয়তান ইয়াশিন দুর্ভেদ্য চক্রান্ত জাল সৃষ্টি করিয়া, এই অনর্থ ঘটাইয়াছে। হায়! এই সময়ে যদি বৃদ্ধা দাই তাহার বাড়ীতে থাকিত!

কাজি কেন যে তাহার উপর এই চরম দণ্ড বিধান করিল, তাহার গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে গুলের বেশী বিলম্ব হইল না। সে বুঝিল—বহু দিনের একটা রাগ, বহু পুরাতন একটা অপমান ও নিরাশার জন্য প্রতিহিংসা লইবার সুযোগ পাইয়া, এই নিষ্ঠুর হৃদয় কাজি তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছে।

তারপর সে ভাবিল—"মৃত্যুই আমার পক্ষে এখন শান্তি। ইহ ও পরকালের সেতু হইতেছে এই—মৃত্যু! জন্ম ও মৃত্যু ত জগতে চিরদিন ঘটিয়া আসিতেছে। জন্মিলেই ত মরিতে হয়। যদি সেই দিনের মূর্চ্ছা আমার না ভাঙ্গিত, যদি আমি সেই ভীষণ রোগ হইতে মুক্তিলাভ না করিতাম, তাহা হইলে আজ এ অপমান, এ লাঞ্ছনা, এ কলঙ্ক ভোগ করিতে হইত না। এস মৃত্যু! এস সখা! তুমি আমায় আশ্রয় করিলে আমার এ প্রেম পিপাসিত আত্মা, কাশেমের সহিত মিলিত হইবে। খোদার শান্তিময় চরণতলে আমি চির আশ্রয় লাভ করিব।"

রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। কারাকক্ষ দ্বার দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। কক্ষমধ্যে সূচীভেদ্য অন্ধকার। এমন সময়ে কে একজন অতি নিঃশব্দভাবে সেই কক্ষের দ্বার খুলিল। তাহার আপাদ মস্তক বোরখার মত একটা সুদীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ আবরণে আবরিত। হাতে একটী লণ্ঠন।

আগন্তুক কারাকক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, গুল্‌নেয়ার সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"কে তুমি? হত্যাকারী! শীঘ্র কাজ শেষ করিয়া ফেল! আমি মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।"

সেই আগন্তুক মৃদু হাস্যের সহিত বলিল—"না—তোমায় মরিতে দিব না। আমি তোমাকে বাঁচাইতে আসিয়াছি। আমি তোমার পরম মিত্র।"

গুল্‌নেয়ার নিরাশভাবে বলিল—"না তুমি আমার ঘোর শত্রু। যে নিষ্কলঙ্ক নারী চরিত্রে গভীর কলঙ্ক পড়িয়াছে—তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা তাহার শত্রুতা করা বই আর কিছু নয়।"

আগন্তুক গুল্‌নেয়ারের নিকট হইতে তিন চারি হাত দূরে দাঁড়াইয়াছিল। আর তার হাতে যে আলোটী ছিল—তাহাও তত উজ্জ্বল নহে। সেই আলোতে এই অন্ধতমসাচ্ছন্ন কারাকক্ষের সুগভীর অন্ধকার তিলমাত্র বিদূরিত হইতেছিল না।

আগন্তুক গুল্‌নেয়ারের মুখের সম্মুখে সেই লণ্ঠনটী তুলিয়া ধরিয়া বলিল—"দেখ দেখি, ভাল করিয়া। আমায় তুমি চিনিতে পার কি না?"

সহসা সম্মুখে কালসর্প দেখিলে প্রান্তর-পথবাহী পথিক যেমন চমকিয়া উঠে, এই আগন্তুককে চিনিতে পারিবামাত্রই, অভাগিনী গুল্ মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া উঠিল।

কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক অবস্থায় থাকিয়া সে বলিল—"এ কি! কাজি সাহেব! আপনি এ সময়ে এ ভাবে আসিয়াছেন কেন?"

কাজি সাহেবের নাম ওম্‌রাত খাঁ। ওম্‌রাত খাঁ সহাস্যে বলিলেন—"তোমাকে বাঁচাইব বলিয়া।"

গুল্। কিরূপে বাঁচাইবেন?

কাজি। আমি তোমায় এই কারাগার হইতে মুক্তি দিব।

গুল্। তারপর?

কাজি। তুমি যাহা ভাল বিবেচনা করিবে, তাহাই করিও।

গুল্। আর এ মুক্তির সঙ্গে যে একটা ভীষণ কলঙ্ক লিপ্ত থাকিয়া যাইবে। তাহার উপায়?

কাজি। তারও উপায় আমি করিব?

গুল্। উপায়টা কি দয়া করিয়া আগে আমায় বলিবেন কি?

কাজি। তোমাকে আমি আমার অন্তঃপুরে আশ্রয় দিব। তোমাকে আমার—

দর্পবিস্ফারিত নেত্রে, বিচিত্র গ্রীবাভঙ্গি করিয়া গুল্ বলিল—"হাঁ বুঝিয়াছি—বিলাসদাসীরূপে, কামপত্নীরূপে, আপনি আমায় আশ্রয় দিবেন। কেমন কি না? এটা আশ্রয় দেওয়া—না আগেকার অপমানের প্রতিশোধ লওয়া সাহেব? এটা উদারতা—না ঘোর হীনতা। এটা দয়া—না সাংঘাতিক নিষ্ঠুরতা সাহেব?"

কাজি। যাহাই বল না কেন—আমি তোমার রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। একবার তোমাকে পত্নীরূপে পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমায় পাই নাই। এবার না হয় বিলাসদাসীরূপে সে চেষ্টা করিব। অনেক চেষ্টায় তোমার রূপের স্মৃতির বিলোপ করিয়াছিলাম, কিন্তু এতদিন পরে আবার সে সুপ্ত বাসনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

গুল্নেয়ার মনে মনে সেই সাংঘাতিক সময়েও একটু আনন্দ উপভোগ করিল। বলিল—"আপনার কথায় বিশ্বাস কি? আমায় যে মুক্তি দিবেন, তজ্জন্য সুলতানের স্বাক্ষরিত পরোয়ানা কই?"

কাজি সাহেব মনে মনে স্থির ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, যে এই গুল্‌নেয়ার বিনা আপত্তিতে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতা হইবে। কাজেই তিনি একটু দর্পভরে বলিলেন—"এই বসোরা সহরের প্রধান বিচারক হইতেছি আমি। বিচারবিধান আমারই হাতে। আমার খুস্ মেজাজের হুকুম অনুসারে অপরাধী মরে বা বাঁচে। এ সম্বন্ধে সুলতান কে? আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, তোমায় দণ্ড দিয়াছিলাম, আর এখন আমার ইচ্ছা হইয়াছে, তোমায় মুক্ত করিব—তাহাই হইবে।"

গুল্‌নেয়ার এ দর্পময় উত্তরে মনে মনে হাসিল। সে বলিল—"না সাহেব! আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত নই। যদি আপনি আমাকে শাস্ত্র মতে প্রকাশ্যভাবে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার প্রস্তাবে রাজি হওয়া উচিত কিনা, একবার না হয় ভাবিয়া দেখি। আমার আর একটা কথা এই যে, এই বিবাহের আগে যিনি এখন আপনার পত্নীরূপে বিরাজিতা, তাঁহাকে তাল্লাক দিতে হইবে।"

কাজি বিরক্তির সহিত বলিল—"অসম্ভব!"

গুল্‌নেয়ার বলিল—"আমিও বলিতেছি, আপনার এ ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মতি দানও আমার পক্ষে অসম্ভব!

কাজি। বাহুল্যালাপের সময় এ নয় গুল্‌নেয়ার বিবি! ভুলিয়া গেলে কি তুমি, যে আর এক ঘণ্টা কাল তোমার পরমায়ু! তার পরই দুনিয়ার সহিত তোমার সকল সম্পর্কই লোপ হইবে।

গুল্। যে দুনিয়ায়—ইয়াশিনের মত শয়তান আছে, আপনার মত হীন প্রবৃত্তির লোক আছে—সে দুনিয়া গুল্‌নেয়ারের চোখে জাহান্নমের অপেক্ষাও অধম—হেয়—পরিত্যজ্য। এ মৃত্যুর পর, পরলোকে যখন আমি আমার স্বামীর পার্শ্বে গিয়া বসিব, তখন অক্ষয় পরমায়ু পাইব।

কাজি সাহেব দেখিলেন—অদ্ভুত দৃঢ়চেতা ও নির্ভীক এ রমণী! মৃত্যু যাহার শিয়রে—সে কিনা এই সময়ে এই সব বাজে কথায় সময় নষ্ট করিতেছে।

কাজি সাহেব লণ্ঠনটী নামাইয়া রাখিয়া, গুলের দিকে অগ্রসর হইলেন। ব্যাধ ভয়-ভীতা হরিণীর মত, গুল্ ক্ষিপ্রগতিতে সরিয়া দাঁড়াইল।

কাজি সাহেব বলিলেন—"আর আমি বিলম্ব করিতে পারি না। এখনই আমার প্রস্তাবে সম্মত হ'। ব্যভিচারিণী তুই—তোর এত দর্প অসহনীয়!"

"আর তোমার মত ঘৃণিত কুক্কুরের এ হীন প্রস্তাবও অতি অসহনীয়। যে পরলোকগত মহাত্মা কাশেমের ধর্ম্ম-পত্নীকে এরূপ শীলতা বর্জ্জিতভাবে অপমান করিতে সাহস করে, যে তাহাকে ব্যভিচারিণী বলে, তাহার এই পুরস্কার।" এই কথা বলিয়াই গুল্‌নেয়ার তাহার চরণ হইতে পাদুকা খুলিয়া লইয়া কাজিকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। জুতাটা কাজি সাহেবের গায়ে লাগিল।

ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত ভীষণ গর্জ্জন করিয়া কাজি ওমরাত খাঁ বলিলেন—"বটে রে শয়তানী! এত স্পর্দ্ধা তোর! এখনিই এর প্রতিফল দিতেছি।"

কাজি ওমরাত খাঁ, তাঁহার বক্ষ মধ্য হইতে একটী সংকেত-বংশী বাহির করিয়া তাহাতে সজোরে ফুৎকার দিলেন।

তাঁহার অনুচরেরা কারাকক্ষের বাহিরের উঠানে অপেক্ষা করিতেছিল। সংকেতধ্বনি শুনিবামাত্রই, তাহারা তখনই সেখানে উপস্থিত হইল।

তাহাদের সর্দ্দার যে, সে সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া বলিল—"হুকুম কি স্বামিন্?"

কাজি। রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখনই এই শয়তানী

আওরাতকে বধ্য ভূমিতে লইয়া গিয়া ভূমিতে প্রোথিত কর। ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিও না। যাও এখনিই ইহাকে লইয়া যাও।" আর কিছু না বলিয়া কাজি সাহেব অতি ক্রুদ্ধভাবে কারাকক্ষ ত্যাগ করিল।

"যো—হুকুম" বলিয়া সর্দ্দার প্রহরী, কারাকক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া গুল্‌কে বলিল—"বিনা ওজরে আমাদের সঙ্গে এস বিবি! নচেৎ আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধে তোমার অঙ্গস্পর্শ করিতে বাধ্য হইব।"

গুলনেয়ার দৃঢ় স্বরে বলিল—"তোমাদের গৃহেও কন্যা ভগিনী আছে। আমায় তোমরা বেইজ্জত করিও না। আমি বিনা আপত্তিতে তোমাদের সঙ্গে যাইতেছি।"

সেই কারাগারের বাহিরের প্রাচীরের পার্শ্বদেশ দিয়া, এক নদী বহিয়া যাইতেছে। এই নদী তীর হইতে আট দশ রশি দূরে বধ্য ভূমি।

সেই বধ্য-ভূমিতে উপস্থিত হইয়া, সর্দ্দারের আদেশে তাহার সঙ্গী প্রহরীরা, সমাধি খনন করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে অনেকটা সময় কাটিয়া গেল। গুল্‌নেয়ারের মনে যে আশা, যে সাহসটুকু ছিল, ক্রমশঃ খনিত সেই সমাধির গভীর অবস্থা দেখিয়া তাহা যেন শরতের মেঘের মত কোথায় উড়িয়া গেল।

সে উদাস ও পলকহীন দৃষ্টিতে, প্রহরীদের এই নিষ্ঠুর কার্য্য প্রণালী দেখিতেছিল। তাহার চক্ষে বিন্দুমাত্র অশ্রু নাই। আর প্রাণে কি যেন একটা অপূর্ব্ব দৃঢ়তা দেখা দিয়াছে।

আর একটু বাদে সে জীবন্ত অবস্থায় প্রোথিত হইবে। কিন্তু তাহাতেও তাহার ভয় নাই। সকল আশা চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তাহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে, কোথা হইতে একটা সাহস ও

ঈশ্বরে নির্ভরতা আসিয়া, তাহার প্রসূন কোমল হৃদয়কে পাষাণের অপেক্ষা সুদৃঢ় করিয়াছে।

সে মনে মনে ভাবিল—"হয়তো বিধাতার নিকট অজ্ঞাতসারে আমি কোন পাপ করিয়াছি। তাহা না হইলে, আমার এমন শোচনীয় পরিণাম ঘটিবে কেন? এখনও আমার দৃঢ় ধারণা, আমায় পত্নীরূপে লাভ করিতে না পারিয়া, ইয়াশিন আজ আমার এ দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছে। খোদার কাছে প্রার্থনা করি, সে সুখে থাক—দীর্ঘজীবি হউক। একদিন এই সাংঘাতিক পাপের জন্য তাহাকে অনুতপ্ত হইতেই হইবে।"

এই সময়ে সমাধি-খনন কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছিল। সর্দ্দার-রক্ষক দেখিল, যে আকাশ বড়ই মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। এই সব দেখিয়া, সে শীঘ্র শীঘ্র তাহার সাংঘাতিক কাজটা শেষ করিয়া লইবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইল।

সে গুল্‌নেয়ারের দিকে চাহিয়া বলিল—"বিবি! তুমি এখনই এই সমাধি মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া দুনিয়ার পরপারে চলিয়া যাইবে। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে একবার খোদার নাম কর। এজন্য আমরা তোমায় সময় দিতে প্রস্তুত।"

গুলনেয়ার উর্দ্ধনেত্রে যুক্তকরে—সেই অন্ধকার সমাচ্ছন্ন—মেঘাবৃত মসীময় আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল "মেহেরবান খোদা! চরণে আশ্রয় দাও প্রভু! কাশেম—কাশেম! আমায় তোমার বুকে তুলিয়া লও।"

সে আর বলিতে পারিল না। তখনই বাতাহতা বল্লরীর মত ভূমিতে পড়িয়া গেল।

সর্দ্দার প্রহরী ব্যস্তসমস্ত হইয়া, তাহার খুব কাছে সরিয়া আসিল। তাহার মুখের নিকটে আলোক লইয়া গিয়া দেখিল, সে মুখ বিবর্ণ। নাড়ী পরীক্ষায় বুঝিল, তাহার স্পন্দন অতি মৃদু।

সর্দ্দার প্রহরী তাহার সঙ্গীদের বলিল—"আর কেন ? যে পাঁচ মিনিট পরে ম'রবে—তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গের চেষ্টা করায় লাভ কি ? খুব মেঘ করিয়াছে এখনিই ভয়ানক বৃষ্টি আসিবে। চল, আমরা লাসটাকে ঐ গর্ত্তে ফেলিয়া মাটী চাপা দিয়া চলিয়া যাই।"

আর যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহারা ধরাধরি করিয়া গুলের নিস্পন্দ দেহ, সেই খনিত সমাধি মধ্যে নিক্ষেপ করিল। তারপর কোদালি সহায়তায় মাটী সরাইয়া, সমাধিকে অদ্ধাবৃত করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

তখন অন্ধকাররাশি মথিত করিয়া শন্ শন্ শব্দে জোর হাওয়া বহিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই হাওয়ার উপর ভর করিয়া, বৃষ্টি আসিল। আর গুলনেয়ারের জন্য সেই নূতন খনিত সমাধি বর্ষাধারায় সিক্ত হইয়া, যেন তাহার জ্বালাময় প্রাণে একটু শান্তি দিল। তাহার উপরের স্তরের মৃত্তিকাগুলি শিথিল হইয়া পড়িল।

(১৪)

"যদি কেউ কোথায় নিকটে থাক, আমাকে জীবন্ত সমাধি হইতে উদ্ধার কর।"

রজনীর শেষ যামের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, এই কাতর অনুরোধ বাণী সেই নৈশ প্রকৃতির চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বধ্যভূমিটা নদীর খুব কাছে। নদীবক্ষে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা, সেই সময়ে ধীর গতিতে যাইতেছিল। নৌকামধ্যস্থ আরোহীর সতর্ক কর্ণে—রমণীকণ্ঠ নিঃসৃত অস্ফুট চীৎকার ধ্বনি পৌঁছিল।

আবার কাতর কণ্ঠে চীৎকার—"এক নিরীহ অবলাকে উদ্ধার কর। দুষমনেরা আমায় মাটীতে পুঁতিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে।"

সেই নৌকারোহী মাঝিকে বলিল—"যত শীঘ্র পার, নৌকা তীরে ভিড়াও।"

নৌকারোহী, এক বলিষ্ঠ পুরুষ। নৌকাখানি তীর দেশে পৌঁছিবামাত্রই তিনি সলম্ফে কূলে নামিয়া পড়িলেন।

নৌকার চারি জন মাঝি ছিল। তাহাদের লক্ষ্য করিয়া সেই আগন্তুক বলিলেন—"তোমরা দুজন একটা আলো লইয়া আমার সঙ্গে নামিয়া আইস। দুইজন নৌকায় থাক। ব্যাপার কি একবার দেখিতে হইবে।"

একরশি পথ অতিক্রম করিবার পর, আলোক সাহায্যে সেই আগন্তুক দেখিলেন—সত্য সত্যই এক নারীদেহ সেই সমাধি গর্ভে অৰ্দ্ধ প্রোথিত। স্ত্রীলোকটী এত দুর্ব্বল—যে প্রাণপণে উঠিবার চেষ্টা করিয়াও উঠিতে পারিতেছে না।

সেই আগন্তুক, তাঁহার একজন সঙ্গীকে বলিলেন—"নৌকার মধ্যে লৌহাস্ত্র আছে। শীঘ্র লইয়া আইস।

অস্ত্র আসিল। তখন দুইজনে সেই সমাধি খুঁড়িতে আরম্ভ করিল আর একজন মাটী সরাইতে লাগিল। প্রায় দশ পনর মিনিট পরিশ্রমের পর—উপরের সমস্ত মাটী স্থান চ্যুত হইয়া গেল।

সেই প্রৌঢ় ব্যক্তি, রমণীকে সমাধি হইতে উদ্ধার করিয়া নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষতলে বসাইলেন। একজন দৌড়িয়া গিয়া, নৌকা হইতে স্নিগ্ধ পানীয় আনিল।

ধীরভাবে মুখে চোখে জলের ছিটা দিবার পর, সেই রমণীর পূর্ণ চেতনা

হইল। সে বলিল—"আরও একটু জল দাও আমায়। তৃষ্ণায় প্রাণ যাইতেছে।"

জল পান করিবার পর, সেই আসন্ন মৃত্যু মুখ হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত রমণী ক্ষীণ স্বরে বলিল—"আপনি আজ আমার পিতার কাজ করিলেন। ওঃ! কি কষ্ট।"

সেই প্রৌঢ় বয়স্ক উদ্ধারকারী, স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"মা! আমি তোমায় কন্যা সম্বোধন করিতেছি। কোন ভয় নাই মা তোমার! তুমি যখন আমার কন্যা, তখন আমার নৌকায় যাইতে কোন আপত্তি আছে কি? তোমার আকৃতি দেখিয়া বোধ হইতেছে, যে তুমি সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভূতা। আমার পত্নী নৌকা মধ্যে আছেন। তোমার সেবা যত্নের কোন ত্রুটিই হইবে না।"

সেই রমণী বলিল—"না—আমার কোন আপত্তিই নাই, বা থাকিতে পারে না। আপনি এখন আমার জীবন রক্ষক—পিতা। এখন যে আমি অনেকটা সুস্থ হইয়াছি, সেটা আপনার মহত্বে। এ দুনিয়ায় আমার আপনার বলিতে কেহ নাই, কোন আশ্রয়স্থল নাই। চলুন আপনার সঙ্গেই যাইতেছি।"

সকলে নৌকায় উঠিল। সেই রমণী সভয় চিত্তে চারিদিকে চাহিয়া বলিল—"আপনারা কোথায় যাইবেন।"

সেই প্রৌঢ় ব্যক্তি বলিলেন—"অনেক দূরে।"

সেই রমণী আশার আলোক দেখিতে পাইয়া, সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—"ভালই হইয়াছে। এখনই নৌকা ছাড়িয়া দিতে বলুন।"

যুবতীর এইরূপ ব্যাকুলতা ও ব্যস্তভাব দেখিয়া, সেই প্রৌঢ় ব্যক্তি মাঝিদের বলিলেন—"এখনি নৌকা খুলিয়া দে। আর খুব জোরে বাহিয়া

যা। এখানে আমাদের একটু দেরী হইয়া গিয়াছে। মনে যেন থাকে, প্রভাতের পূর্ব্বেই আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌছিতে হইবে।"

মাঝিরা তাহাদের প্রভুর আজ্ঞা তখনই পালন করিল। সেই প্রৌঢ় ব্যক্তি বলিলেন—"তুমি ভিতরের কামরায় যাও মা। সেখানে আমার পত্নী নিদ্রা যাইতেছেন।"

তাঁহার পত্নীও তখন একটা গোলযোগ শুনিয়া, জাগিয়া উঠিয়াছিলেন। ভিতর হইতে তিনি সবই দেখিতেছিলেন ও শুনিতেছিলেন। স্বামীর ইঙ্গিত পাইবামাত্রই, তিনি সেই আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত যুবতীর হাতখানি স্নেহভরে নিপীড়িত করিয়া বলিলেন—"এস মা! ভিতরে এস।"

নৌকার ভিতর সুবাসিত স্নিগ্ধ বারি ও খাদ্য ছিল। গৃহিনী, সেই যুবতীকে অনেক জেদ করিয়া কিছু খাওয়াইলেন। এক পাত্র উত্তেজক দ্রব্যপূর্ণ সরবত পান করিয়া সেই যুবতী যেমন নবজীবন প্রাপ্ত হইল।

সে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চিত্তে বলিল—"সত্যই আর জন্মে তুমি আমার মা ছিলে। তা নইলে এত যত্ন এত মমতা, তোমার আমার প্রতি?"

সেই প্রৌঢ়া রমণী এ প্রশ্নের উত্তরে কেবলমাত্র মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"নৌকার ভিতরে থাকিলেও আমি কতক দেখিয়াছি ও তোমাদের অনেক কথা শুনিয়াছি। কাল প্রভাতে তুমি সুস্থ হইলে আমাদের এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইবে। এখন তুমি নিশ্চিন্ত চিত্তে নিদ্রা যাও।"

সেই বিপদমুক্তা যুবতীকে তিনি তাঁহার পার্শ্বে শোয়াইলেন। রজনীর শেষ যামে, স্নিগ্ধ নদীর বাতাসে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

সেই প্রৌঢ়া রমণীর চোখে কিন্তু নিদ্রা নাই। এই যুবতীকে দেখিবামাত্রই তিনি যেন একটু মমতার দৃঢ় পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন।

এত রূপ, এমন সুন্দর সারল্য মণ্ডিত মুখশ্রী, তিনি আর কখনও দেখেন নাই।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া নিদ্রাহীন নেত্রে তাহাকে কখনও বা ব্যজন করিয়া কখনও বা তাহার গায়ে মৃদুভাবে হাত বুলাইয়া কখনও বা তাহার ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চূর্ণ অলকরাজি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়া, তিনি এই বিপদমুক্তা অনাথার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

কথায় বলে—"চোখের গুণে ভালবাসা।" উভয়ের মধ্যে প্রথম সাক্ষাতটা নিশ্চয়ই কোন শুভ মুহূর্ত্তে ঘটিয়াছিল। নচেৎ এতটা মমতা স্রোত সেই প্রৌঢ়ার বুকের ভিতর উছলিয়া পড়িবে কেন? এই প্রৌঢ়া রমণীর কন্যা নাই। তিনি ভাবিলেন, বিধাতা তাঁহাকে অদ্ভুত উপায়ে একটা কন্যা রত্ন মিলাইয়া দিয়াছেন।

তিন চারি ঘণ্টা কাল সেই নৌকাখানা প্রবল গতিতে টাইগ্রীসের উপর দিয়া চলিয়াছে। কোথায় যে যাইতেছে, তাহারও স্থিরতা নাই।

যে প্রৌঢ় ব্যক্তি, এই বিপন্না রমণীকে পূর্ব্বোক্ত অপ্রত্যাশিত ও অসম্ভব উপায়ে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তিনি ও সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারিলেন না। তাঁহার পত্নী জাগরিত অবস্থায় আছেন, তাহা তিনি জানিতেন। কাজেই মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে এই যুবতীর অবস্থা সম্বন্ধে, দুই একটী প্রশ্ন করিতেছিলেন মাত্র।

লোকে কথায় বলে "কালরাত্রি।" এই যুবতীর পক্ষে পূর্ব্বের রজনী সত্যসত্যই কালরাত্রি রূপে উপস্থিত হইয়াছিল। কেননা—মৃত্যুর মুখ হইতে সে অতি অসম্ভব উপায়ে রক্ষা পাইয়াছে।

যথাসময়ে এই কালরাত্রির অবসান হইল। এই দুনিয়ার লোকের সুখ আর দুঃখের মুখের দিকে চাহিয়া ত দিন আর রাত অপেক্ষা করে না।

গুল-কাশেম

ঊষার ধূসর আলোকে আকাশ ক্রমশঃ অন্ধকার হীন হইয়া আসিতেছে। স্নিগ্ধ প্রভাত সমীর, টাইগ্রীসের বক্ষোদ্ভূত ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলির শীকরসংগ্রহ করিয়া, সেই প্রভাতকে আরও মধুময় ও স্নিগ্ধ করিতেছে।

ঊষার প্রভাবে যখন অন্ধকার সরিয়া গেল—তখন তিনি তাঁহার পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হামিদা! তোমার সেই কুড়ানো মেয়েটী এখন কেমন আছে গো?"

স্বামীর এই প্রশ্নে, পত্নী হামিদা বিবি হাস্যমুখে বলিলেন—"এখন সে অঘোরে ঘুমাইতেছে। নিদ্রার অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, এখন আর তাহার কোন কষ্ট নাই।"

প্রৌঢ় ব্যক্তি বলিলেন—"খোদা উহাকে রক্ষা করুন। দেখ হামিদা! আমরা ত বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন উহাকে লইয়া করা যায় কি?"

হামিদা। কেন উহাকে আমি আমাদের বাড়ীতেই লইয়া যাইব। কন্যার মত পালন করিব।

স্বামী। কিন্তু আমরা যে কে, তাহা ত ও জানে না। জানিলে কি হইবে? সত্য কথা শুনিলে ও আমাদের কাছে থাকিবে কি?

হামিদা। আমাদের পরিচয় পাইলেও ও আমাদের কাছে থাকিবে, কেননা—মায়ার বাঁধনের চেয়ে জোর বাঁধন আর কিছুই নাই। আমি মেয়ের মত উহাকে মানুষ করিব। ও কখনই আমায় ত্যাগ করিবে না।

স্বামী। যদি উহার স্বামী, পিতা বা আপনার জন কেউ থাকে, আর তাহাদের কাছে ও ফিরিয়া যাইতে চায়, তাহা হইলে এই মায়াই তোমাকে

ভবিষ্যতে কষ্ট দিবে। যাহা তোমার নয়, তাহার জন্য তোমার এতটা আকর্ষণ যে ভবিষ্যৎ কষ্টের কারণ, তার আর সন্দেহ নাই।"

হামিদা নির্ব্বন্ধপূর্ণ স্বরে বলিল—"আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক। উহাকে আমি বাড়ী লইয়া যাইব। যতদূর বুঝিতেছি, উহার আপনার বলিতে কেহ নাই। আর যাহারা আছে, তাহাদের কাছেও উহার স্থান নাই। তাহা হইলে, উহাকে ওরূপভাবে তাহারা হত্যা করিবার চেষ্টাই বা করিবে কেন?"

হামিদার স্বামী বলিলেন—"তোমার কোন ইচ্ছাতেই আমি কখনও বাধা দিই নাই। তুমি যখন এ ব্যাপারে ঝুঁকিয়াছ, তখন তাহাতে আমি কোন আপত্তিই করিব না।"

এই কথা বলিয়া হামিদার স্বামী নৌকাচালকগণকে—নিকটস্থ এক ঘাটে নৌকা ভিড়াইতে বলিলেন।

ঘাটের পাশ দিয়া একটী রাস্তা বরাবর দক্ষিণ মুখে চলিয়া গিয়াছে। এই ক্ষুদ্র নগরের একদিকে মরুভূমি ও ক্ষুদ্র পাহাড় শ্রেণী আর একদিকে এই টাইগ্রীস শাখা।

নগরটীর আয়তনও বিস্তৃত নয়, আর তাহার মধ্যে বাড়ী ঘরের সংখ্যা খুব কম। পাকা বাড়ী দুই চারিখানি। আর বাকী সব—কুটীর শ্রেণী।

(১৫)

পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন—সমাধি গর্ভ হইতে উদ্ধৃতা এই রমণী আর কেহই নয়—গুল্‌নেয়ার।

অভূতপূর্ব্ব উপায়ে রক্ষা পাইয়া, গুল্‌নেয়ার নিশ্চিত মৃত্যুমুখ হইতে আবার জীবনের সীমায় ফিরিয়া আসিল। রাখে খোদা—মারে কে?

পূর্ব্বরাত্রে আকাশে প্রবল মেঘসঞ্চার দেখিয়া প্রহরীরা তাহাদের সর্দ্দারের আদেশে খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিয়া চলিয়া যায়। পরে সহসা বৃষ্টি আসায়, আর সেই বৃষ্টির ফলে সমাধির কতক মাটী ধুইয়া যাওয়ায়, আতঙ্কে মূর্চ্ছিতা, গুল্‌নেয়ার পুনরায় সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইয়াছিল। তারপর সমাধিগর্ভ হইতেই সে কাতরভাবে চীৎকার করিয়া উঠায়, সে চীৎকার নৌকাগামী প্রৌঢ় ব্যক্তির কর্ণগোচর হয়। তারপর সে কি করিয়া উদ্ধার পায়, পাঠক তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখিয়াছেন।

প্রভাতের প্রারম্ভে নৌকা যখন তীরে লাগিল, তখন লোকজনের গোলমালে, গুল্‌নেয়ারের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

সে বিনা আপত্তিতে হামিদা বিবির পশ্চাৎবর্ত্তিনী হইল। হামিদা যে বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, তাহার অবস্থা দেখিলে এক সঙ্গতিপন্ন লোকের বাড়ী বলিয়াই বোধ হয়।

গুল্‌নেয়ারকে সঙ্গে লইয়া হামিদাবানু উপরের এক কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কক্ষটী উন্নত ও রুচি সঙ্গতভাবে সুসজ্জিত।

সেই গৃহের গৃহিণী ঘরণী, কর্ত্রী হইতেছেন এই হামিদাবানু। জামাল খাঁর আদরিণী পত্নী—এই হামিদা বিবি।

হামিদা, গুল্‌নেয়ারকে সুখাসনে বসাইয়া বলিলেন—"মা! আমি তোমায় কন্যা সম্বোধন করিয়াছি। খোদার কৃপায় আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে তুমি বাঁচিয়া গিয়াছ। এ তোমার নিজের ঘর দোর বলিয়া মনে করিবে। কোন বিষয়েই সংকোচ করিবে না। এখন এস আমার সঙ্গে। আগে তোমায় স্নান করাইয়া ও কিছু খাওয়াইয়া আনি। তারপর অন্য কথা হইবে।"

গুল্‌নেয়ার অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল—"মা! আপনারা আমার মত অভাগিনীর জীবন রক্ষা করিয়াছেন। এজন্য আপনাদের কাছে এ ছার জীবনের জন্য আমি চির কৃতজ্ঞ। মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ ভাবিয়া, এক সময়ে আমি মৃত্যু প্রার্থনা করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার মাতৃবৎ-স্নেহ দেখিয়া আবার বাঁচিতে সাধ হইয়াছে। আপনারা যাহা করিতে বলিবেন, তাহাতেই আমি প্রস্তুত।"

হামিদা, গুল্‌নেয়ারকে সঙ্গে লইয়া স্নানাগারে গেলেন। স্নানান্তে বহুমূল্য বস্ত্রাদি দ্বারা তাহার বেশ ভূষা করাইলেন। গত রাত্রের মৃত্যুছায়া মলিন পাণ্ডুবর্ণ চিন্তাক্লিষ্ট মুখে, যেন একটা অপূর্ব্ব লাবণ্য ফুটিয়া উঠিল। সে রূপপ্রভা দেখিয়া হামিদা কেন—বাড়ীর দাস দাসীরাও মনে করিল, ইনি হয়তো নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশী শাহজাদী।

পূর্ব্বেকার স্বাস্থ্য ও চিত্তের প্রফুল্লতা ফিরাইয়া আনিয়া, এই বুদ্ধিমতী হামিদা, গুল্‌নেয়ারের জীবনের সমস্ত ঘটনাই একে একে অবগত হইলেন। আর তাহার জীবনের বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া, তিনি বড়ই বিস্মিত হইয়া পড়িলেন।

সকল কথা শুনিয়া হামিদা স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"মা! তোমার পিতামাতা নাই। আমরাই তোমার পিতামাতার স্থান অধিকার করিলাম। কন্যার আমার বড় সাধ। তা তোমাকে এই অদ্ভুত উপায়ে পাইয়া, আমরা খোদাকে ধন্যবাদ দিতেছি।"

সেই দিন উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, হামিদা বিবি এই অভাগিনী গুল্‌নেয়ারের জীবনের সম্বন্ধে সমস্ত কথাই তাঁহার স্বামীকে শুনাইলেন। তিনিও সমস্ত কথা শুনিয়া, তাঁহার পত্নীর ন্যায় বিস্মিত হইলেন।

অপরাহ্ন পূর্ব্বে—গুল্‌নেয়ারের ডাক পড়িল। ডাকিয়াছেন—গৃহের মালিক খোদ জামাল ওস্‌মান। ইনিই গুল্‌নেয়ারের উদ্ধারকর্ত্তা।

গুল্‌নেয়ার সংকুচিত হৃদয়ে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল—"আপনি কি আমায় স্মরণ করিরাছেন জনাব?"

গুল্‌নেয়ার রাত্রে ওস্‌মান জামালকে দেখিয়াছিল—আর সে সময়ে তার দর্শনশক্তির তীক্ষ্ণতাও তেমন ছিল না। কিন্তু এখন সে দেখিল, ওসমানের মুখশ্রী অতি গম্ভীর। দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ। সে দৃষ্টি দেখিলে অনেক সাহসীর হৃদয়ও ভয়ে কাঁপিয়া উঠে। সুতরাং অভাগিনী গুল্‌নেয়ার; তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু ভয় পাইল।

ওসমান সাহেব, গুল্‌নেয়ারকে নিকটস্থ এক আসনে বসিতে অনুরোধ করিলেন। তৎপরে ধীর স্বরে বলিলেন—"হাঁ মা! আমিই তোমাকে ডাকিয়াছি। তোমার সঙ্গে দুটো কাজের কথা কহিবার জন্য।"

গুল্‌নেয়ার বলিল—"আপনি আমার জীবনরক্ষা করিয়াছেন। আপনি পিতা—আমি কন্যা—"

ওস্‌মান বলিলেন—"মা! আমিও তোমাকে কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি! কিন্তু—"

গুল্। কিন্তু কি?

ওসমান। কিন্তু আর কিছুই নয়। আমার প্রকৃত পরিচয় জানিলে হয় ত তুমি ভয়ে শিহরিয়া উঠিবে। আমি বসোরা প্রান্তের বিখ্যাত বেদুইন দস্যুরাজ—জামাল ওসমান খাঁ।"

পরিচয় পাইয়া গুল্‌নেয়ার মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সেই সুচতুরা তখনই তাহার মনোভাব গোপন করিয়া বলিল—"আপনি যেই

হউন, যখন আপনাকে পিতৃ সম্বোধন করিয়াছি, তখন আপনার কাছে থাকিতে আমার কোন সংকোচ নাই। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি জনাব ?"

ওসমান। কি কথা ?

গুল্‌নেয়ার। আপনার দলই কি বসোরার সুলতানের লোকজনকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে ? তাহাদের প্রধান যাঁহারা, তাঁহাদের হত্যা করিয়াছে ?

এই সাংঘাতিক প্রশ্ন করিবার সময় গুল্‌নেয়ারের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। এই জামাল ওসমানের হাঁ—কিম্বা—না এই দুইটী কথার সহিত তাহার ভাগ্য যে দৃঢ়রূপে বিজড়িত !

জামাল খাঁ গুল্‌নেয়ারের মুখের এই পরিবর্ত্তিত ভাবটি লক্ষ্য করিলেন। তৎপরে ধীর স্বরে বলিলেন—"তুমি স্ত্রীলোক। তোমার এসব ঝঞ্ঝাটী ব্যাপারের সংবাদে প্রয়োজন কি মা ?"

"একটু প্রয়োজন আছে। কারণ সেই দলে আমার স্বামী ছিলেন।"

"তোমার স্বামীর নাম ?"

"কাশেম ?"

জামাল খাঁ বলিলেন—"তোমাকে আমি কন্যা সম্বোধন করিয়াছি, সুতরাং তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলিব না। বসোরার সুলতানের সহিত আমাদের খুব সৌহার্দ্দ্য। আমরা তাঁহাকে আমাদের মালেক বলিয়া মনে করি। তাঁর রাজ্যের সীমানাগুলিকে অপর দস্যুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করি বলিয়া, আমরা বৎসরে তাঁহার নিকট হইতে পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা নজরানা পাই। আমাদের এক বিরুদ্ধ দল আছে—তাহারা

বসোরার সুলতানের শত্রু। এ লুঠের কাজ, খুব সম্ভব তাহাদের দ্বারাই হইয়াছে।"

কথাটা শুনিয়া গুল্‌নেয়ারের মনটা খুবই দমিয়া পড়িল। সে বলিল—"কোন রূপ চেষ্টা করিয়া আপনি আমার স্বামীর সংবাদ আনাইতে পারেন কি?"

জামাল খাঁ বিস্মিত নেত্রে একবার গুল্‌নেয়ারের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন—তাহার নেত্রপল্লব অশ্রুভারাক্রান্ত। তিনি কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিয়া বলিলেন—"সংবাদ আনাইতে পারি। তবে একটু চেষ্টা করিতে হয়। সে দল বসোরার সুলতানের শত্রু হইতে পারে, কিন্তু আমাদের নয়। আর এখন এই বিরুদ্ধ দলের নেতা যে—তার নাম রিয়াজ সোলতান! এই লোক আগে আমার সহকারী ছিল। এখনও এজন্য সে আমাকে যথেষ্ট খাতির করে। আমি যদি তাহার কাছে লোক পাঠাই তাহা হইলে—হয়ত এ সম্বন্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারি।"

জামালখাঁর মুখে এই কথা শুনিয়া, গুল্‌নেয়ার তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া বলিল—"আপনাকে পিতৃ সম্বোধন করিয়াছি। আমার এই উপকারটুকু করুন। আমার স্বামীকে আমি চাই না—তিনি জীবিত আছেন, বিনা পীড়নে আছেন, নিরাপদে আছেন, এই সংবাদটুকু পাইলেই আমি কৃতার্থ হইব।"

জামাল খাঁ, নীরব হাস্যের সহিত বলিলেন—"যদি সে জীবিত থাকে, তার কোন সন্ধান করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাকে ফিরিইয়া আনিয়া, তোমার অই মলিন মুখে হাসি ফুটাইয়া আমি পিতার কর্ত্তব্য পালন করিব।"

জামালখাঁর এই কথায় গুল্‌নেয়ার যেন একটা আশার আলোক দেখিতে

পাইল। সে মনে মনে এই দস্যুপতি জামালখাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিল।

তারপর সে মনে ভাবিল—"ইয়াশিন যে কাশেমের মৃত্যু সংবাদ রটনা করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কাশেম চলিয়া যাইবার পর হইতে হয়তঃ সে মনে একটা কু-উদ্দেশ্য পোষণ করিতেছিল, আর সেই জন্যই হয়ত সে একটা মিথ্যা চক্রান্ত করিয়া তাঁহার মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ রটনা করিয়াছে। ইয়াশিনের অসাধ্য কাজ ত কিছুই নাই!"

যে বিপদের প্রতিকার নাই, যাহা হইতে উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই—এরূপ স্থলে লোকে যখন একটুও আশার আলোক দেখিতে পায়, তখন নিরাশার—যাহা কিছু, তাহার সবই বাদ দিয়া, আশার স্বপ্নে উদ্‌ভ্রান্ত হইতে থাকে। গুল্‌নেয়ারের তাহাই হইল।

জামাল খাঁ গুল্‌নেয়ারের মুখের দিকে চাহিবামাত্রই বুঝিলেন—তাঁহার কথায় সে যেন অনেকটা আশান্বিতা হইয়াছে। তিনি চান, যে কয়দিন গুল্‌নেয়ার তাঁহার কাছে থাকিবে, সে যেন হাসি মুখেই থাকে। কাজেই তিনি তাহার সুখস্বপ্নটাকে আরও প্রবল করিয়া দিবার জন্য বলিলেন—"মা! আমি যখন তোমায় আশা দিয়াছি, তখন জানিও—এই কাশেমের সংবাদ আমি যত শীঘ্র পারি, তোমাকে আনিয়া দিব। আর তোমার প্রতীতির জন্য—পুনরায় বলিতেছি, সে যদি জীবনে বাঁচিয়া থাকে—তাহা হইলে এই বাড়ীতেই তার সঙ্গে তুমি মিলিত হইবে।"

গুল্‌নেয়ারকে বিদায় দিয়া, জামাল খাঁ অন্য কাজে চলিয়া গেলেন। গুল্‌নেয়ারও একটা হাল্‌কা প্রাণ লইয়া হামিদা বিবির সংসার কার্য্যের সহায়তার জন্য প্রস্থান করিল।

(১৬)

জামাল ওসমান জাতিতে বেদুইন। কিন্তু সে আজীবন দস্যু নয়। আর তাহার দস্যুতার প্রণালীও নূতন ধরণের। তার ভিতর একটু রহস্য জড়িত আছে।

জামাল খাঁ দামস্কসের অধিবাসী কোনও এক সম্ভ্রান্ত বণিকের সন্তান। তাঁহার পিতা কয়েকজন বণিকের সহিত যৌথ কারবারে নিযুক্ত ছিলেন। পরিশেষে তাঁহার অংশীদারেরা এক চক্রান্ত করিয়া, তাঁহার পিতাকে প্রতারিত করে। এই প্রতারণার ফলে, জামালখাঁর পিতা হৃতসর্ব্বস্ব ও পথের ভিখারি হন। শেষ এই শত্রুদের সমবেত চেষ্টার ফলে, তাঁহার পৈত্রিক দেনার জন্য বাস্তু ভিটা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া যায়। জামাল খাঁ পথের ভিখারি হন। আর পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর, এই সব শত্রুপক্ষের চেষ্টায় তাঁহার ভিটা হইতে বিতাড়িত হন।

জামাল খাঁ যখন বুঝিতে পারিলেন—যে এই ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে ও নিষ্ঠুরতায় তাঁহার এই দশা ঘটিয়াছে—তখন তিনি দামাস্কসবাসী সমস্ত মহাজন মাত্রেরই ঘোর শত্রু হইয়া উঠিলেন। তিনি তাহাদের উচ্ছেদের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন।

কিন্তু তখন তাঁহার ক্ষমতা কম। তিনি একাবারে অর্থ সামর্থ্য বিহীন। তবে তাঁহার গায়ে প্রচুর শক্তি, আর মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি ছিল। জামাল খাঁ দামস্কস্ ত্যাগ করিয়া মেরূস্ নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামে আত্মগোপন করিয়া দিনকতক বাস করিলেন। এই সময়ে তাঁহার নব বিবাহিতা পত্নী হামিদাও তাঁহার সঙ্গে ছিল।

জামাল খাঁ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনে মনে স্থির করিলেন—"দামাস্কস্ বাসী মহাজন মাত্রেই তাঁহার শত্রু। কেন না তাঁহাদের সকলেরই দ্বারস্থ হইয়া তিনি পিতৃ হস্তচ্যুত সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার জন্য, অনেক কাতর অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু কেহই তাঁহাকে সমবেদনা প্রদর্শন করে নাই। বলা বাহুল্য, এই সব মহাজনগণ বহু মূল্য পণ্যসম্ভার লইয়া বসোরা, সিরিয়া, দামাস্কস্, ইরাণ ও তুরান প্রদেশে ব্যবসায়ার্থে যাত্রা করিত।

জামালখাঁর প্রখর বুদ্ধি ছিল, বাহুতে শক্তি ছিল, মাথায় মতলব ছিল কাজেই সে শীঘ্রই একটা লুণ্ঠনের দল বাঁধিয়া বসিল। বাজে মহাজনের জিনিসপত্র লুঠ করা জামালের উদ্দেশ্য ছিল না। তাহার বিশ্বস্ত সঙ্গীরা, ফল বিক্রেতা ও শ্রমজীবির বেশে, এই সব মহাজনদের সঙ্গে মিশিত। আর দামাস্কসবাসী ধনী মহাজনের সন্ধান পাইলেই জামালকে সংবাদ দিত। আর জামাল যখন এই নির্ব্বাচিত দস্যু সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিত, তখন হত্যা ও সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের কিছুই বাকি থাকিত না।

ক্রমে ক্রমে জামালের দলে এত লোক আসিয়া জমিল, আর তাহারা এত দুর্দ্ধর্ষ ও অমিতশক্তিশালী, যে বসোরাধিপতি সুলতান নওয়াজেস্ খাঁ, জামালকে উচ্ছেদের জন্য সেনা প্রেরণ করিলেন। বলা বাহুল্য, জামালের আকস্মিক নৈশ আক্রমণের প্রভাবে, সেই সৈন্যদলের অধিকাংশই লোপ পাইল।

পাছে এই অমিতশক্তিশালী দস্যুদল, তাঁহার রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোনরূপ উৎপাত করে এই ভাবিয়া, বসোরাধিপ—প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া জামালওসমানের সঙ্গে একটা সন্ধি করিলেন, যে সে বসোরা সরকার হইতে বাৎসরিক পাঁচ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা তলবানা স্বরূপ পাইবে ও তৎপরিবর্ত্তে

বসোরা সুলতানের প্রজাগণকে যাহাতে অন্য দস্যুদল আক্রমণ করিতে না পারে, তাহার ভার তাহাকে লইতে হইবে।

এদানীং জামাল ওসমান এই দস্যুবৃত্তি দ্বারা অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহার প্রতিযোগী দলের মধ্যে কাহারও এত অর্থ সম্পদ ছিল না। কাজেই দস্যুতার উপর তাহার একটা বিরাগ জন্মিয়া গিয়াছিল। সে কালে ভদ্রে কখন কখনও প্রয়োজন বুঝিয়া দস্যুতা করিত বটে, সেটা কেবল অন্য দলকে বাড়িতে না দিবার জন্য, আর তাহার নিজের দলের নাম ডাক ও প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য।

বর্ত্তমানে জামাল, এই নির্জ্জন পল্লীগ্রামে, ক্ষুদ্র প্রাসাদতুল্য এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া, শান্তিময় জীবন যাপন করিতেছিল। সংসারের মধ্যে তাহার পত্নী এই হামিদাবানু আর তাহার শ্যালক—হামিদার সহোদর সরফরাজ খাঁ।

বলা বাহুল্য, এই ক্ষুদ্র নগরের অধিবাসীগণ জামাল খাঁকে তাহাদের রাজা বলিয়াই জানিত। আর জামাল খাঁও তাঁহার মুক্ত হস্ততার জন্য, এই দরিদ্র গ্রামের অবস্থাহীন লোক জনের মা-বাপের মত হইয়া পড়িয়াছিল।

জামাল কোন সাংসারিক কাজের জন্য সপত্নীক নৌকা করিয়া বসোরায় গিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন সময়ে তিনি কি করিয়া এই অভাগিনী গুল্‌-নেয়ারকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠক পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখিয়াছেন।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। তাহার অন্ধকারময় হৃদয়ে, অতি ক্ষীণ এক আশার আলোক, জ্বালাইয়া, গুল্‌নেয়ার তাহার দিনগুলি কাটাইতে লাগিল।

জামাল পত্নী হামিদা তাহাকে খুবই স্নেহ করেন। গুল্‌নেয়ারও তাঁহাকে

মায়ের মত ভক্তি করে। গুল্ তাঁহার হাত হইতে কাজকর্ম্ম কাড়িয়া লইয়া অতি সুন্দররূপে তাহা সমাধা করিয়া দেয়। গুলের সুবন্দোবস্তে, গৃহসজ্জা-গুলির সুশৃঙ্খলতা বাড়িয়াছে। তাহার উজ্জল রূপপ্রভায় সেই কক্ষের চারিদিকে বিচিত্র সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। চাকর দাসীরা সকলেই তাহার অমায়িক ব্যবহারে পরিতৃপ্ত।

কে জানে কোথা হইতে গুল্‌নেয়ারের মনে এমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যে কাশেম মরে নাই। সে এখনও বন্দীভাবে তথায় আছে। আর তাহার উদ্ধারের উপায় নাই, এ সংবাদটা কোনরূপে জানিতে পারিয়াই—শয়তান ইয়াশিন তাহাকে লাভ করিবার জন্য, এই ভীষণ চক্রান্তজাল সৃষ্টি করিয়া তাহাকে এরূপ শোচনীয়ভাবে নিগৃহীত করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জামাল খাঁর এক শ্যালক—তাহার নাম সরফরাজ, তাহার ভগ্নিপতির গৃহে বাস করিত। গুল্‌নেয়ার যে রাত্রে এখানে আসে, তাহার পরদিন সে এই সরফরাজকে জামাল খাঁর কুঠীতেই দেখিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর সে আর তাহাকে জামাল খাঁর বাটীতে দেখিতে পায় নাই।

সরফরাজ সহসা কোথায় চলিয়া গেলেন, গৃহিণীর কাছে এ কথাটা সে জানিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আর এই অনুসন্ধানের ফলে সরফরাজ যে তাহার স্বামীর সংবাদ আনিবার জন্য জামাল খাঁ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে, তাহাও সে শুনিল।

এই সরফরাজ-বাহিত সংবাদই তখন তাহার জীবন মরণের কাঠি। সে যদি ভাল সংবাদ আনে, তাহা হইলে সে বড়ই সুখে থাকিবে। আর যদি তাহা না হয়? তাহা হইলে—তাহা হইলে?

না—আর সে ভাবিতে পারে না! এ "তাহা—হইলের" উত্তর যাহা,

তাহা সে পাইবার ইচ্ছাও করে না। তাহার আশার স্বপ্ন যেন অকালে ভাঙ্গিয়া না যায়, এ জন্য সে দিন রাতই বিধাতার কাছে প্রার্থনা করে।

বাহির মহলে গৃহস্বামী জামাল খাঁর দুইটী কক্ষ ছিল। একটীতে তিনি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতেন, আগন্তুকদের সম্বর্দ্ধনা করিতেন। আর তাহার পার্শ্বের কক্ষটী, তাঁহার দিবসমানের শয়নকক্ষ। এই কক্ষের তদারকী ভার গুল্‌নেয়ারের উপর ন্যস্ত ছিল।

উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন। সমুজ্জ্বল রবিকর টাইগ্রীসের ধূসরাভ চঞ্চল সলিল রাশির উপর পড়িয়া, চক্‌চক্ করিতেছে। সে দিনের হাওয়া খুব গরম। সমস্ত প্রকৃতি যেন দারুণ উষ্মায় স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে।

এই মধ্যাহ্নে গুল্‌নেয়ার—জামালের শয়ন কক্ষ মধ্যে ছিল। সে সেই কক্ষটীর প্রয়োজনীয় কাজগুলি সারিয়া, এক দৃষ্টে অগ্নিকণা পূর্ণ, মেঘশূন্য নীলাকাশ ও স্তব্ধ প্রকৃতির দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া, কত কি ভাবিতেছিল।

এমন সময়ে সে দেখিল—কে একজন, প্রান্তরের পথ ধরিয়া অতি দ্রুত বেগে অশ্ব ছুটাইয়া আসিতেছে। বেশী দূরের দিকে চাহিতে গেলে, সূর্য্য কিরণে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, এজন্য সে দক্ষিণ করে চোখটী ঢাকিয়া দেখিল—কে এই লোক—যে অতটা দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া তাহাদেরই বাড়ীর দিকে আসিতেছে।

লোকটা আরও একটু নিকটস্থ হইলে সে দেখিল, এই দ্রুতগামী-অশ্বারোহী—সরফরাজ খাঁ। কিন্তু সরফরাজ অত দ্রুত আসিতেছে কেন? প্রচণ্ড রৌদ্রের জন্য—না সে কোন দুঃসংবাদ বহন করিয়া সে আনিতেছে?

যদি শেষেরটাই তাহার দ্রুতাগমনের কারণ হয়, তাহা হইলে কি হইবে?

এই চিন্তায়, ভয়ে তাহার মুখ শুখাইল। বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। তবে সে এটুকু বুঝিল, এই সরফরাজ নিশ্চয়ই তাহার স্বামীর সংবাদ লইয়া আসিতেছে—তা সে সংবাদ ভালই হউক, আর মন্দই হোক।

বুকের উপর দুইটী হাত রাখিয়া, সে তাহার বুকটাকে একটু জোরে চাপিয়া ধরিল। তাহাতে যেন হৃদয়ের অত্যধিক স্পন্দনটার আংশিক নিবৃত্তি হইল।

সে মনে মনে বলিল—"খোদা! মেহেরবান! দেখিও প্রভু—যেন তোমার চিরদাসীর সকল আশা ভরসা একেবারে না চূর্ণ হইয়া যায়।"

ওসমান জামাল, তখন নিজের বিশ্রাম কক্ষে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে ধূমপান করিতেছিলেন। সে কক্ষে আর কেহ নাই। আর গুল্‌নেয়ার ঠিক তার পাশের কক্ষেই ছিল। জামাল খাঁ শয়ন করিবার জন্য সেই কক্ষে আসিলেই নিত্য প্রথামত সে-গৃহিণীর নিকট, উপরের ঘরে চলিয়া যায়।

সে তখন বড়ই অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছে। কিছুতেই সে চিত্ত দমন করিতে পারিতেছে না। সে মনে মনে ভাবিল—"হয়ত সরফরাজ খাঁ, বাড়ীতে পৌঁছিয়াই সকলের আগে জামালখাঁর সহিত দেখা করিবে। তারপর সে—তাহার ভগ্নির সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপরে যাইবে।"

সরফরাজের সহিত জামালখাঁর কি কি কথাবার্ত্তা হয়, তাহা গোপনে শুনিবার জন্য, গুল্‌নেয়ার সেই কক্ষ মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থান করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিল।

সেই কক্ষদ্বয়ের মধ্যে একটী মাত্র দ্বার ব্যবধান। এই দ্বারের গায়ে এক স্থানে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল। সেই ছিদ্রের উপর চক্ষু রাখিয়া, গুল্‌নেয়ার দেখিল, সরফরাজ তখনও সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে সে দেখিল—সরফরাজ খাঁ সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ভগ্নিপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আদাব ওসমান সাহেব!"

ওসমান জামাল—দেখিলেন, সরফরাজখাঁর মুখখানা সূর্য্যতাপে ও পথশ্রমে লাল হইয়া উঠিয়াছে। বহু দূর অশ্ব পৃষ্ঠে আসায়, তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষে প্রচুর ধুলি লাগিয়াছে।

জামাল সরফরাজের অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—"বসো—ওখানে; আগে তুমি দম্ নাও। তারপর তোমার কথা শুনিব।"

ওসমান জামাল, শট্‌কার নলটী হাতে লইয়া ঘন ঘন টান মারিতে লাগিলেন, আর তাঁহার মুখগহ্বরনিসৃত তাম্রকূট ধূমে, কক্ষটা যেন অন্ধকার-ময় হইয়া উঠিল।

পথশ্রমকাতর সরফরাজের এই সামান্য বিশ্রামকালটুকু, পার্শ্বস্থ কক্ষে লুকায়িতা, স্বামীর সংবাদ জানিতে সমুৎসুক হৃদয়া, গুল্‌নেয়ারের পক্ষে অতি দীর্ঘ, অতি অসহনীয় হইয়া উঠিল।

সরফরাজ খাঁ অনেকটা স্নিগ্ধ হইলে, জামাল খাঁ আগ্রহ পূর্ণ স্বরে বলিলেন—"আমি প্রতিক্ষণেই তোমার আগমন প্রত্যাশা করিতেছি। তোমার এত দেরী হইল কেন—সরফরাজ?"

সরফরাজ। আর সাহেব! যে হাঙ্গামের কাজে আপনি আমায় পাঠাইয়া ছিলেন! সহজে কি সে কাজ মেটে?

জামাল। ব্যাপার কি? সর্ব্বাগ্রে একটা কথা বল দেখি, যে সংবাদ তুমি আনিয়াছ, তাহা ভাল কি মন্দ?

জাফররাজ। মন্দের ভাল।

জামাল। কাশেম জীবিত আছে কি?

সরফরাজ। খুব সম্ভব!

জামাল। এটুকু স্থির সন্ধান পাইয়াছ ত—যে তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই?

সরফরাজ। না। যে দিন প্রভাতে তাহাকে হত্যা করিবার আদেশ প্রচারিত হয়—তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রে, কারাপ্রহরীকে সে এক বহুমূল্য অঙ্গুরীয় উপহার দিয়া, কারাগার হইতে পলাইয়াছে।

জামাল। সে যে পলাইয়াছে, এ সংবাদ কাশেমের উদ্ধারকর্ত্তা সেই প্রহরীর কাছে পাইলে নাকি?

সরফরাজ। না; এই প্রহরীও কাশেমের পলায়নের পরদিন হইতে কারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। আপনার পত্র দেখাইয়া আমি দস্যুপতির নিকট হইতে কাশেমের পলায়ন সংবাদ অবগত হইয়াছি। কেবল তাই নয়, কাশেমের পোষাক একটী, আর প্রহরীকে ঘুস স্বরূপ দেওয়া সেই আংটিটী আপনার নাম করিয়া, আমার কথার প্রমাণ স্বরূপে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি।

জামাল খাঁ উৎসুক নেত্রে, সরফরাজের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সে আংটীটি কই?"

সরফরাজ খাঁ—আংটীটি তাহার আচকানের মধ্য হইতে অতি সন্তর্পণে বাহির করিয়া জামালখাঁর হাতে দিল।

জামাল খাঁ দেখিলেন, সেই অঙ্গুরীয়ের যথা স্থানে কাশেমের নাম খোদিত। তিনি সেই অঙ্গুরীয়কটী সযত্নে নিকটস্থ এক বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিয়া বলিলেন—"আর কি নিদর্শন আনিয়াছ?"

সরফরাজ তাহার কোমরে জড়ানো একটী ক্ষুদ্র পুটলীর মধ্য হইতে

কাশেমের মাথার সাঁচ্চা টুপি ও বসোরার সুলতানের নামাঙ্কিত একখানি পত্র জামালখাঁর হাতে দিল।

জামাল খাঁ সেই টুপিটী উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাহার ভিতরের এক স্থানে দুইটী ক্ষুদ্র গোলাপ ফুল, সুচী কার্য্যের দ্বারা তোলা আছে। সেই দুইটী গোলাপের মধ্যে ব্যবধান এক ইঞ্চি। তাহার এক পার্শ্বে লেখা আছে "গুল্"। অপর পার্শ্বে লেখা আছে "কাশেম"।

পত্রখানি পড়িয়া তিনি বুঝিলেন—সেই পত্রখানি দামাস্কসের সুলতানের নিকট বসোরার সুলতানের রত্নবণিক, এই কাশেমের পরিচয়-পত্র। অবশ্য কাশেম দস্যু হস্তে বন্দী হওয়ায়, পত্রখানি দামাস্কসাধিপতির নিকট পৌছায় নাই।

সমস্ত প্রমাণগুলি সরফরাজের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া তিনি তাঁহার হাতবাক্সের মধ্যে রাখিলেন। তারপর বলিলেন—"এই টুপী ও পত্র কে তোমায় দিল?"

সরফরাজ বলিল—"আপনি সর্দ্দারকে লিখিয়া ছিলেন—কাশেম সম্বন্ধে যদি কোন অভিজ্ঞান থাকে, আমাকে পাঠাইবে।" এগুলি আপনার সেই অনুরোধের ফল।

জামাল খাঁ কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিয়া বলিলেন—"কাশেম যে জীবিত আছে, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ কই? তুমি আমায় যেগুলি দিয়াছ, এগুলি তাহার হত্যার পরও ত সংগ্রহ হইতে পারে।"

সরফরাজ বলিল—"অবশ্য এ সম্বন্ধে আমাকে দস্যুপতির কথাতেই বিশ্বাস করিতে হইবে। সে যে আপনাকে মিথ্যা কথা বলিয়া প্রতারিত করিবে, ইহাও অসম্ভব। কারণ সে আপনার অনেক নিমক খাইয়াছে।

তার উপর, যে প্রহরী কাশেমকে অঙ্গুরীর লোভে মুক্তি দিয়াছিল, সে এখন বন্দী হইলেও তার মুখের কথাই আমাদের প্রামাণ্য ভাবিতে হইবে। লোকটা দস্যুসর্দ্দারের অতি প্রিয় ও অতি বিশ্বাসী। দস্যুপতির মনে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছে, যে সেই-ই কাশেমকে ছাড়িয়া দিয়াছে। এজন্য সে তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

জামাল। সেই কারা প্রহরী যে সত্য কথা বলিয়াছে, তারই বা প্রমাণ কি?

সরফরাজ। তার প্রমাণ এই, আমি তাহাকে সর্ব্ব প্রথমেই বলি—"জামাল খাঁ তোমাদের সর্দ্দারকে সুপারিস করিলে তুমি নিশ্চয়ই মুক্তি পাইবে। কিন্তু তার আগে তোমায় শপথ করিয়া সত্য কথা বলিতে হইবে, যে কাশেমকে প্রকৃতই হত্যা করা হইয়াছে কিনা? সে সরল প্রাণে সকল কথা স্বীকার করিয়া শেষ বলিল—"আমিই উৎকোচের লোভে কাশেমকে ছাড়িয়া দিয়াছি। কাশেম তাহাকে বলিয়াছিল যে অঙ্গুরী তোমায় দিতেছি, তার দাম হাজার টাকা। তাহা ছাড়া আমি মুক্ত হইয়া নিরাপদে বাড়ী পৌছিলে সুযোগ বুঝিয়া তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিও। আমি তোমাকে আরও দুই হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিব।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি জামাল খাঁ সরফরাজকে এই ভাবে জেরা করিয়া বুঝিলেন, সরফরাজ বিশেষ কৌশলের সহিত কাশেম সম্বন্ধে এই সংবাদগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে।

তিনি সরফরাজকে বলিলেন—"যাও তুমি এখন বিশ্রাম কর গে। তোমার সহোদরা তোমার ফিরিয়া আসিবার বিলম্ব দেখিয়া, বড়ই উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন। সকলের আগে তাঁহার সঙ্গে দেখা কর গে।"

সরফরাজ উপরে চলিয়া গেল। পার্শ্বের কক্ষে থাকিয়া গুল্ সমস্ত কথাই শুনিল। সেই কক্ষতলে বসিয়া সে যুক্তকরে, অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিল "মহিমাময় খোদা! তোমার করুণার অবধি নাই। এ অভাগিনীর উপর তোমার বড়ই দয়া। তাহা না হইলে আজ অসম্ভব উপায়ে আমি আমার প্রাণাধিক কাশেমের সম্বন্ধে এ অপূর্ব্ব সংবাদ পাইব কেন? আমি কাশেমকে চাইনা, চাই তাহার জীবন। তাহার সাহচর্য্য চাহি না, দাম্পত্যে জীবনের সুখ চাহি না। সে যেখানে থাক নিরাপদে থাক্—বাঁচিয়া থাক্ এই আমার তোমার কাছে কাতর প্রার্থনা।"

তার পর গুলনেয়ার ভাবিল—"এখনই জামাল খাঁ বিশ্রামার্থে সেই কক্ষে আসিবেন। সুতরাং সে তখনই উপরের কক্ষে হামিদা বিবির নিকট চলিয়া গেল।

সরফরাজকে হামিদা বিবির কক্ষ মধ্যে উপবিষ্ট দেখিয়া,গুল্‌নেয়ার ভিতরে ঢুকিতে একটু সংকোচ করিতেছিল।

হামিদা বিবি তাহার এ সংকোচভাব দেখিয়া বলিলেন—"ভিতরে এস না মা! কিসের লজ্জা! সরফরাজ আমার সহোদর।"

গুল্‌নেয়ার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সলজ্জভাবে একবার সরফরাজের মুখের দিকে চাহিয়া, মাথাটী একটু অবনত করিয়া তাহাকে একটী সেলাম করিল।

আজ সরফরাজ? সে বিস্মিতনেত্রে দেখিল,তাহার সম্মুখে বিদ্যুতপ্রভাময়ী, অপূর্ব্ব রূপশালিনী, এক জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী মূর্ত্তি! এত রূপ সে আর কখনও চোখে দেখে নাই।

বিধাতা যেন এই রমণীকে সর্ব্ববিষয়েই নিখুঁত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। চোখ, মুখ, বর্ণ, দেহের গঠন কোথাও কি কোন ত্রুটি নাই। নবীন

বসন্তের মলয়স্পর্শে, বসোরার গুলাবগুলি যেমন অফুরন্ত মাধুরী লইয়া উদ্যান আলো করিয়া ফুটিয়া থাকে, এই গুলনেয়ার যেন সেই রূপেই তাহাদের গৃহকক্ষ উজ্জ্বলিত করিয়া আছে।

সরফরাজের মনে মনে ইচ্ছা হইল, সে যেন আর ও একবার সেই অপূর্ব্ব মাধুরী নয়ন ভরিয়া দেখে। গুলনেয়ারের সহিত দুটো কথা কহিয়া, তাহার দীর্ঘ পথশ্রমের ক্লান্তি নাশ করে। কিন্তু ভগিনীর সম্মুখে এ ভাবের স্পর্দ্ধাটুকু দেখাইতে, তাহার সাহসে কুলাইল না।

আর গুলনেয়ার! তাহারও যেন কেমন একটা লজ্জা বোধ হইতেছিল। সে সরফরাজের সম্মুখে আরও বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে কেমন একটা সংকোচবোধ করিতেছিল।

অথচ তাহার মন বলিতেছিল—"কিসের লজ্জা? কিসের ভয়? পার যদি, এই সরফরাজকে নিভৃতে লইয়া যাও। কাশেমের সম্বন্ধে আরও যদি কিছু তোমার জানিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা গোপনে জানিয়া লও। যে তোমার জন্য এতটা কষ্ট স্বীকার করিয়া এমন একটা বহুমূল্য সংবাদ আনিল—যে সংবাদের উপর তোমার জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে—তাহাকে দুটো মিষ্ট কথা বলিয়া একটা কৃতজ্ঞতা জানানও তো তোমার কর্ত্তব্য!"

কিন্তু সে এ কর্ত্তব্যও যেন পালন করিতে পারিল না। কেননা ঠিক এই সময়ে নীচে হইতে একজন বাঁদী আসিয়া তাহাকে বলিল—"বিবি! জামাল সাহেব আপনাকে ডাকিতেছেন।"

জামাল সাহেব যে কেন ডাকিতেছেন, তাহা সে তখনই বুঝিতে পারিয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিল। জামাল খাঁ তখন তাঁহার মধ্যাহ্ন কালের বিশ্রাম কক্ষে শয্যা আশ্রয় করিয়াছেন। দুই জন বাঁদী তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে।

জামাল খাঁ, গুলনেয়ারকে তাঁহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বাঁদীদের চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন।

তৎপরে জামাল খাঁ সহাস্যমুখে বলিলেন—"মা! তোমার নিকট আজ আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারিয়াছি, এজন্য বড়ই আনন্দিত। কাশেম কারাগার হইতে পলাইয়াছে। আর সে প্রাণেও বাঁচিয়া আছে। করুণাময় খোদা তোমাকে মহাবৈধব্য হইতে রক্ষা করিয়াছেন!"

গুলনেয়ার জামাল খাঁর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া অবনতমুখে বলিল—"আপনার নিকট এ অধিনী এ ছার জীবনের জন্য ইতিপূর্ব্বেই কৃতজ্ঞ।"

তার পর সে তাঁহার বস্ত্র প্রান্ত চুম্বন করিয়া বলিল—"আপনি আমার জন্য যাহা করিয়াছেন— তাহা পিতারই কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি দীনা-হীনা-অভাগিনী। এ কৃতজ্ঞতার প্রতিদান দিতে আমি অসমর্থ।"

জামাল খাঁ সহাস্যে বলিলেন—"আপনা—আপনির মধ্যে কর্ত্তব্য করিতেই আমরা এ দুনিয়ায় আসিয়াছি। এ সম্বন্ধে কোন ঋণ বাধ্যতাই জন্মায় না। জগতের নিয়মই হইতেছে এই, একজন খোদার প্রেরণায় তাহার কর্ত্তব্য করে, আর একজন তাহার ফলে উপকৃত হয়। যখন এ সম্বন্ধে দান প্রতিদান বা দেনা পাওনার কথা ভাবিব, তখন আমিই তোমার নিকট হইতে আমার প্রাপ্য দান চাহিয়া লইব। যাক—এ সব কথা। এখন তোমায় ডাকিয়াছি কেন—তাহা বলিতেছি।"

এই কথা বলিয়া জামাল খাঁ, তাঁহার হাতবাক্সের ভিতর হইতে একটী কিম্মতিয়া জহরতের অঙ্গুরী বাহির করিয়া বলিলেন—"বলিতে পার গুলনেয়ার! এ অঙ্গুরী কাশেমের কিনা? বসোরা ত্যাগ করিবার সময় এ অঙ্গুরী তার হাতে ছিল কিনা?"

গুলনেয়ার সেই অঙ্গুরীর ভিতর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিল, তন্মধ্যে কাশেমের নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। সে বলিল,—"হাঁ এইটীও আর একটী অঙ্গুরীয়, তিনি যাইবার সময় পরিয়া গিয়াছিলেন। এই দুইটী অঙ্গুরীর একটী, আমার হাতে তাঁহার মৃত্যুর প্রমাণ রূপে বহুপূর্ব্বে আসিয়াছে। আর, এটি আজ তাঁর জীবনের প্রমাণ রূপে আপনার কাছে দেখিতেছি। আমার বেশ মনে আছে, এই বহুমূল্য অঙ্গুরীয়কটী আমিই জেদ করিয়াই তাঁহাকে পরাইয়া দিয়াছিলাম।"

জামাল। ভাল! যে টুপী, তিনি মাথায় দিয়া গিয়াছিলেন তাহা দেখিলে চিনিতে পারিবে কি?

গুলনেয়ার। খুব পারিব।

জামাল। তাহা হইলে দেখ দেখি এইটী কাশেমের টুপী কিনা?

গুলনেয়ার সেই টুপী দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিল। তাহার ভিতরের দিকে, সূচের কাজকরা গোলাপ দুটী, আর তাহার নিজের ও কাশেমের নাম লেখা ছিল, সেটা তাহারই সোহাগের ও সখের শিল্প রচনা।

তাহার ইচ্ছা হইল, সেই টুপিটী সে তখনই বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া সে তাহার প্রাণের তৃষা নিবারণ করে। কিন্তু সেটী জামাল সাহেবের নিকট হইতে চাহিয়া লইতে তাহার বড়ই লজ্জা বোধ হইল।

জামাল খাঁ গম্ভীর মুখে বলিলেন—"অন্য কাহাকে পাঠাইলে ঠিক কার্য্যোদ্ধার হইবে না, এই ভাবিয়াই আমি আমার অতি বিশ্বাসভাজন ও নিকট আত্মীয় সরফরাজকে এই বিপদজনক ও শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। সিরিয়ার এক প্রান্ত হইতে আর এই বসোরার শেষ সীমা পর্য্যন্ত স্থান লুণ্ঠনকারী দস্যুতে পরিপূর্ণ। পথে বিপদ ঘটিতে কতক্ষণ? কাশেমের

অবস্থা হইতেই তুমি ভাবিয়া দেখ না, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বসোরার অধীশ্বরের প্রতিনিধি সে, অত লোক লস্কর তাহার সঙ্গে, তবুও সে দস্যুহস্তে বন্দী হইল। ধরিতে গেলে, এই সব দুর্দ্দান্তপ্রতাপ দস্যুদলই মরু-রাজ্যের ও তাহার বিস্তীর্ণ ভূভাগব্যাপী স্থান সমূহের অধীশ্বর। তাহাদের অসাধ্য কাজ কিছুই নাই, আর তাহারা না করিতে পারে এমন কোন নিষ্ঠুর কাজও নাই। তাই সরফরাজকে তারিফ দিতেছি, সে নানারকমের বিপদ কাটাইয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়াছে। আর সে যে সব বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আনিয়াছে, তাহাতে অনেক কাজ হইয়াছে।"

গুলনেয়ার মৃদুস্বরে বলিল—"কিন্তু—"

জামাল। কিন্তু—কি মা? বলিতে বলিতে সহসা থামিয়া গেলে কেন? কিসে তোমার সন্দেহ জন্মিতেছে?

গুলনেয়ার। কিন্তু আপনি কি বিশ্বাস করেন, যে তিনি সত্য সত্যই জীবিত?

জামাল। যে সব প্রমাণ পাইয়াছি, সবই তাঁর মৃত্যুর বিরুদ্ধে। আমার বোধ হয় কাশেম নিশ্চয়ই জীবিত আছে।

গুলনেয়ার। আমার স্বামীর অনুসন্ধান সম্বন্ধে, আপনি কি এই খানেই নিরস্ত হইবেন?

জামাল। না। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আমি চারিদিকে আমার দলের বিশ্বাসী গোয়েন্দাদের পাঠাইব। আরও আমার মনের ধারণা এই, এ ব্যবস্থায় কৃতকার্য্য না হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই।

গুলনেয়ার মৃদুস্বরে বলিল—"খোদা আপনার মঙ্গল করুন। আমি আপনাকে পিতৃ সম্বোধন করিয়াছি। সুতরাং এই অভাগিনী কন্যার জন্য আপনাকে আরও অনেক কষ্টভোগ করিতে হইবে।"

জামাল খাঁ বলিলেন—"আমিও তোমায় যখন কন্যা সম্বোধন করিয়াছি, তখন তোমার মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য যাহা কিছু আমার করা উচিত, তাহাতে কখনই বিরত হইব না। এই লও মা, তোমার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর এই দুইটী পবিত্র নিদর্শন! ইহা তোমার কাছে থাকিলে তুমি অনেকটা শান্তি পাইবে।"

যে জিনিসটী চাহিতে সে লজ্জা করিতেছিল, অথচ যাহা তাহার সেই মহা দুঃখের সময়ে একটা মহা সান্ত্বনার জিনিস, না চাহিতে তাহা পাইয়া সে বড়ই সুখী হইল। জামালখাঁর উদারতাকে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া, সে সেই কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইল।

(১৭)

রূপ আর রূপেয়ার আধিপত্য লইয়াই এই দুনিয়া। আর এই রূপ ও রূপেয়ার শত্রুও অনেক। কারণ অনেক লোলুপ চক্ষু এই দুইটীর উপর আসিয়া পড়ে—আর তাহা হইতেই এ জগতে যা কিছু অনর্থ উৎপন্ন হয়।

সরফরাজ খাঁ কি কুক্ষণেই যে সেদিন গুলনেয়ারকে দেখিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তাহার ভগ্নি ও ভগ্নিপতি তাহার জন্য অনেক সুন্দরী পাত্রী দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সে নানাবিধ ওজর আপত্তি তুলিয়া, বিবাহে এ পর্য্যন্ত সম্মতি প্রদান করে নাই। সে এই দস্যুপতি জামালখাঁর পত্নীর সহোদর। তাহার এজগতে অর্থের বা কোন জিনিসেরই অভাব ছিল না। আর জামালের উত্তরাধিকারীও কেহ নাই। সে জানিত, খাঁ সাহেবের তিরোধানে সবই তার হইবে।

কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে এই অভাগিনী গুলনেয়ারকে দেখিল, সেই মুহূর্ত্ত

হইতেই তাহার চিত্তবিকার আরম্ভ হইল। সে শয়তানের কাছে আত্ম বিক্রয় করিল। একটা উন্মাদ কল্পনা, তাহার মনের মধ্যে এতটা শক্তি সঞ্চার করিল, যে সেই শক্তিকে সে কোন মতেই উপেক্ষা করিতে পারিল না।

সে তাহার নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া মনে মনে ভাবিতেছিল—"আবার তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, আবার তাহার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা হয়। তাহাকে না দেখিয়া মনে হইতেছে, সকল সৌন্দর্য্য যেন দুনিয়ার বুক হইতে সরিয়া গিয়াছে। পূর্ণতা গিয়াছে—শূন্যতা যেন তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। আলো গিয়াছে—আঁধার আসিয়া দুনিয়ার বুক ছাইয়াছে।"

সে সুযোগ পাইলে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া, এই গুল্‌নেয়ারের রূপরাশি দেখিত। হৃদয়ে দারুণ তৃষ্ণা, অথচ কাছে অগ্রসর হইবার যো নাই।

একদিন সে মনে মনে একটা শয়তানী মতলব আঁটিল। সে ভাবিল—"যদি কোন রকমে গুল্‌নেয়ারের মনে এমন একটা বিশ্বাস জন্মান যায়, যে তাহার স্বামী প্রকৃতই জীবিত নাই, আর আমার আনীত সংবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা, তাহা হইলে সে কি আমায় স্বামীত্বে বরণ করিবে না। আমার না আছে কি? ভগ্নিপতির মৃত্যুর পর, তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য আমার। আমার রূপ আছে, যৌবন আছে, সাহস আছে, বুদ্ধি আছে। কেনই বা সে আমার হইবে না? চেষ্টায় না হয় কি?"

গুল্‌নেয়ারের সঙ্গে এজন্য সে একদিন নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিবার প্রয়াসী হইল। দুই এক দিন অপেক্ষা করিবার পর একদিন তাহার এ সুযোগ ঘটিল।

জামালখাঁর অট্টালিকার পশ্চাতে এক সুন্দর ফুলের ও ফলের বাগান। বাগানটী জামালখাঁর সখের জিনিস, সুতরাং অতি রুচিপূর্ণ ভাবে তাহা

সাজানো। স্থানে স্থানে বিশ্রাম-বেদী ও নিভৃত লতাকুঞ্জ। আর গন্ধভরা অগণিত বসোরাই গুলাব বৃক্ষে, সেই উদ্যানের এক তৃতীয়াংশ পূর্ণ।

একদিন এই উদ্যান মধ্যে গুল্‌নেয়ার, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বেড়াইতে আসিয়াছে। সরফরাজ তাহা দেখিতে পাইল। সে অন্য এক বিপরীত পথ দিয়া বাগানের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে প্রবেশ করিয়া ভাবিতে লাগিল, কি অছিলায় গুল্‌নেয়ারের সম্মুখবর্ত্তী হওয়া যায়।

গুল্‌নেয়ার একটী গুলাব বৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছে। সে মনে মনে ভাবিতেছে—"আহা! এই সুন্দর ফুলটী তার রূপের প্রভায় বাগান আলো করিয়া, এই বৃক্ষের সূক্ষ্ম বৃন্তে দুলিতেছে। মৃদু মলয় তাহাকে অতি ধীরে স্পর্শ করিয়া সোহাগ জানাইতেছে। রূপ রস গন্ধ স্পর্শের যা কিছু মাধুরী—সবই ত এই ফুলটীতে বর্ত্তমান? হায়! ইহাকে বৃন্তচ্যুত করা যে ভয়ানক নিষ্ঠুরতা!"

ফুলটী তুলিবার জন্য একবার সে হস্ত প্রসারণ করিতেছে, আবার সংকোচের সহিত তাহার হাতখানি সরাইয়া লইতেছে। একটু দূরে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া, সরফরাজ তাহা লক্ষ্য করিল। সে তাহার গুপ্ত আশ্রয়স্থানের নিকটস্থ একটী বৃক্ষ হইতে কয়েকটী পুষ্প চয়ন করিয়া, মৃদু পদ বিক্ষেপে, তাহার পশ্চাতে আসিয়া ডাকিল—"গুল্‌নেয়ার!"

সহসা উদ্যান মধ্যে পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া চকিত ভাবে মাথার অবগুণ্ঠনটী কতক টানিয়া দিয়া, সেই গুলাববৃক্ষের নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া, গুল্ দেখিল সরফরাজ খাঁ—তাঁহার সম্মুখে।

সরফরাজ মৃদু হাস্যের সহিত বলিল—"এত কোমল প্রাণ তোমার?

এই ফুলটীকে বৃন্তচ্যুত করিবার জন্য, এত সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলে তুমি গুল্‌নেয়ার ?"

গুল্‌নেয়ার সরফরাজের কথায় যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল; তবুও সে মৃদু হাস্যের সহিত ধীর স্বরে বলিল—"আর আপনি এত নিঠুর, যে অতি সহজেই এতগুলি ফুল বৃন্তচ্যুত করিয়া আনিয়াছেন ?"

সরফরাজ প্রশ্রয় পাইয়া বলিল—"আমরা কঠিনপ্রাণ পুরুষ। তোমাদের কোমলতা আমরা পাইব কোথায় গুল্‌নেয়ার ?"

এতটা আত্মীয়তার সম্বোধন—গুলের কাণে ভাল ঠেকিল না। সে একবার সফররাজের মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার অবগুণ্ঠনটী ঈষৎ টানিয়া দিয়া বলিল—"আমি আপনার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। আমার স্বামীর সংবাদ আনিয়া দিয়া আপনি আমার খুবই উপকার করিয়াছেন।"

এইবার সরফরাজ খাঁ সুযোগ পাইয়া বলিল—"এর জন্য কৃতজ্ঞতার দাবী আমি কিছুই করিতে পারি না। আমি তোমার জন্য যে সংবাদ আনিয়া দিয়াছি—"

সরফরাজ, সহসা চাপিয়া গেল। কথাটা বলিতে বলিতে সহসা থামিয়া যাওয়ায়, গুলের মনে একটা সন্দেহ জন্মিল। সে বলিল—"চুপ করিয়া গেলেন কেন ? আপনার ভাবগতিক দেখিয়া আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ হইতেছে !"

সরফরাজ দেখিল, তাহার কথার কৌশলে অতি সহজেই ঔষধ ধরিয়াছে। সে মলিন মুখে বলিল—"একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, প্রতারণার প্রায়শ্চিত্ত কি গুল্ ?"

গুল্‌নেয়ার সরফরাজের কথার ভূমিকায় ও ভঙ্গিতে বড়ই চমকিত হইয়া

উঠিল। সে কম্পিত স্বরে বলিল—"কাহার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছেন আপনি সাহেব?"

সরফরাজ। তোমারই সঙ্গে!

গুল্‌নেয়ার। আমার সঙ্গে? কিসে?

সরফরাজ। তোমার স্বামীর সম্বন্ধে যে সংবাদ আনিয়া খাঁ সাহেবকে দিয়াছি, তাহার ষোল আনাই মিথ্যা!

গুল্‌নেয়ার। বলেন কি? আপনি কি তাহা হইলে দস্যু-শিবিরে যান নাই?

সরফরাজ। গিয়াছিলাম তাহা খুবই সত্য,—কিন্তু যে প্রমাণ আনিয়াছি, তাহা আমার নিজের মান বাঁচাইবার জন্য সংগৃহীত। আমার ভগ্নিপতি একটা গুরুতর দায়িত্ব ভার, আমায় বিশ্বাস করিয়া দিয়াছিলেন। সেটা পালন করিয়া না আসিতে পারিলে, তাঁহার কাছে আমাকে বড়ই লজ্জা পাইতে হইবে। কাজেই তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য, আমি ঐ দুইটা বাজে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি—যাহার প্রকৃত মূল্য কিছুই নাই।"

গুল্‌নেয়ার। তাহা হইলে কি আমার স্বামী প্রাণে বাঁচিয়া নাই?

সরফরাজ। না—

গুল্‌নেয়ার। এ প্রমাণ দুটী পাইলেন কোথায়?

সরফরাজ। কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম,—দস্যুরা কাশেমকে নিহত করিয়া এক স্থানে প্রোথিত করিয়াছে! অর্থাৎ আমি সেখানে পৌঁছিবার দুই দিন আগেই, কাশেমের প্রাণদণ্ড হইয়া গিয়াছিল। আমি একজন দস্যুকে অর্থ দিয়া বশ করিয়া, কাশেমের সমাধি-স্থানটী জানিয়া লই। তারপর চোরের মত তাহার সমাধি খনন করিয়া—এই পাকড়ী

ও অঙ্গুরীয় তাহার মৃত-দেহ হইতে খুলিয়া লইয়া, নিজের মান বাঁচাইবার আমার কল্পিত কাহিনীর প্রমাণরূপে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি।

কথাটা শুনিয়া গুল্‌নেয়ারের মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সে চারি দিক শূন্য দেখিল। মাটী ধরিয়া ধীরে ধীরে সেইস্থানে বসিয়া পড়িয়া, কপালে করাঘাত করিয়া বলিল—"হায়। দুর্ভাগ্য! এ কি শুনি?"

সে আর কিছু বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠদেশ শুষ্ক, হৃদয়ে দারুণ স্পন্দন, প্রাণে মহা ঝড়, সম্মুখে নিরাশার বিকট অন্ধকার।

সরফরাজের ভাব গতিক দেখিয়া, তাহার মনে সত্যই একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে আবার সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—"না—না—আপনি চিত্ত পরীক্ষার জন্য আমাকে এভাবে প্রতারণা করিতেছেন। কিন্তু এযে ভয়ানক পরীক্ষা সাহেব! ঘোর নিষ্ঠুরতা! আমি আপনাকে এ সাংঘাতিক নিষ্ঠুরতার জন্য মার্জ্জনা করিতে পারি, কিন্তু আপনার ভগীপতি জামাল খাঁ একথা জানিতে পারিলে, কখনই আপনাকে ক্ষমা করিবেন না।"

সরফরাজ বলিল—"গুল্‌নেয়ার! তুমি আমার কথায় বিশ্বাস না কর তাহাতে আমার কোন ক্ষতিই নাই। প্রমাণই আনি, আর যাহাই আনি—নিশ্চয়ই জানিও, কাশেম ইহলোকে নাই! আমি যখন স্বচক্ষে তাহার মৃতদেহ দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা এত শীঘ্র ভুলিয়া যাইব কিরূপে?"

মূর্খ সরফরাজ, অতি নিষ্ঠুরের মত, অতি অবিবেচকের মত, গুলনেয়ারের বুকে পাঁজার আগুণ জ্বালাইয়া দিয়া, সেই উদ্যান ভূমি ত্যাগ করিল। আর গুল্‌নেয়ার একটা প্রচণ্ড আঘাত হৃদয়ে লইয়া, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

সরফরাজ মনে ভাবিয়াছিল, এইভাবে গুল্‌নেয়ারের মনে একটা নিরাশার সঞ্চার করিতে পারিলে, সে একদিন না একদিন তাহার কবলের মধ্যে

আসিবে। আর সাহস করিয়া এই গুলনেয়ার, কখনই একথা জামাল খাঁকে বলিতে পারিবে না। আর যদি বলে, তাহা হইলে জামাল খাঁ, তাহার কিছুই করিতে পারিবেন না। কেন না—হামিদা বিবি বর্ত্তমান থাকিতে তাহার কোন ভয়ই নাই।

একটা বিষের জ্বালা হৃদয়ে লইয়া, গুলনেয়ার তাহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল বটে—কিন্তু সরফরাজের একথাটা সে কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

সেই বাড়ীর প্রবীণা বাঁদী, কুলসম, গুলনেয়ারকে বড়ই ভালবাসিত। একদিন সে এই কুলসমের কাছেই শুনিয়াছিল, সরফরাজ নষ্ট-চরিত্র, মদ্যপায়ী। এই কুলসমই তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল—"গুল বিবি! এই সরফরাজ খাঁর নিকট হইতে সাধ্যমতে দূরে থাকিও। তোমার রূপ আছে, যৌবন আছে। রূপের—শত্রু অনেক। তোমায় ভগ্নির মত স্নেহ করি, তাই সাবধান করিয়া দিলাম।"

এখন সহসা সেই কথাটা গুলের মনে পড়িল। সে ভাবিল—"এই সরফরাজ খাঁ তাহার সহিত প্রতারণা করিতে পারে, কিন্তু তাহার ভগ্নিপতির সহিত পারে না। সে যাহা বলিয়াছে, তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন হীন উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন আছে।" নানাদিক দিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পরে সে ভাবিয়া লইল, এই উদ্দেশ্যটা সম্ভবতঃ কি হইতে পারে? হায়! এ দুনিয়ায় একা ইব্‌লিশই ত শয়তান হইয়া জন্মায় নাই।

গুলনেয়ারের মলিন ও বিশুষ্ক মুখ, সেইদিন সন্ধ্যাগ্রে প্রবীণা বাঁদী কুলসমের চোখেই পড়িল। কুলসম প্রৌঢ়া। সে গুলনেয়ারকে কনিষ্ঠা ভগ্নির মত স্নেহ করিত। আর গুলনেয়ারও তাহাকে তাহার একান্ত

হিতকারিণী ও বিশ্বাসী সঙ্গিনীরূপে পাইয়া, সুখ দুঃখের সকল কথাই তাহাকে বলিত।

কুলসম গুল্‌নেয়ারের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"তোমার মুখখানি আজ এত মলিন কেন গুল্‌বিবি ?"

গুলনেয়ার বলিল—"চুপ কর। হঠাৎ কেউ শুন্‌তে পাবে। বহিন্! কেন যে আমার এ অবস্থা, তোমায় আজ রাত্রে নির্জ্জনে বলিব।"

বলাবাহুল্য গুলনেয়ার যে কক্ষে থাকিত, কুলসম সেই কক্ষের মধ্যেই তাহার শয্যা রচনা করিত। এটী গৃহিণী হামিদার আদেশ। তিনিই তাঁহার বিশ্বাসী খাস বাঁদীকে গুল্‌নেয়ারের দিবারাত্রের সঙ্গিনী করিয়া দিয়াছিলেন। কুলসম অগত্যা তাহার কৌতুহলকে চাপিয়া রাখিয়া, সংসারের কাজে মন দিল। আর গুল্‌নেয়ার খুব একটা প্রবল শক্তিতে, তাহার উদ্বেলিত হৃদয়কে শান্ত ও সংযত করিয়া, কর্ত্রীর নিকটে চলিয়া গেল।

রাত্রে যথাসময়ে সংসারের কাজ কর্ম্ম সারিয়া, কুলসম শয়ন করিবার জন্য গুল্‌নেয়ারের কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, গুল্‌নেয়ার আপাদ মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া শুইয়া আছে। গুল্ তখন সরফরাজ ঘটিত ঘটনাটা নানাদিক দিয়া চিন্তা করিতেছিল। আর ভাবিতেছিল—"কি দুর্ভাগ্য ! যেখানেই যাইব, সেইখানেই কি এই পোড়া রূপ আমার সর্ব্বনাশ করিবে।"

কুলসম, গুল্‌কে নিশ্চলভাবে শয্যায় থাকিতে দেখিয়া বলিল—"গুল্! ঘুমাইয়াছ কি ?"

গুল্‌নেয়ার। না।

কুলসম। রাত্রি দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। তবুও ঘুমাও নাই।

গুল্‌নেয়ার। না তোমাকে সেই কথাগুলি বলিবার জন্য এখনও জাগিয়া আছি। বাড়ীর সকলে ঘুমাইয়াছে কি?

কুলসম। বাড়ীর কেহই জাগিয়া নাই। তবে একজন বোধ হয় জাগিয়া আছে।

গুল্‌নেয়ার। কে—সে?

কুলসম। সে সরফরাজ খাঁ—যে তোমাকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছে! যে তোমার রূপ দেখিয়া মজিয়াছে! যে তোমাকে পাইবার জন্য পাগল!

গুল্‌নেয়ার। তুই জাহান্নমে যা!

কুলসম। এত শীঘ্র?

এই কথা বলিয়া কুলসম, দ্বারটী নিঃশব্দে বন্ধ করিয়া দিয়া গুল্‌নেয়ারের পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

কুলসম বাঁদী বটে, কিন্তু সৎকুলোদ্ভবা। আর বলিতে গেলে ত হামিদার সংসারের গৃহিণীই হইতেছে সেই। হামিদা, সাংসারিক কাজ সম্বন্ধে বড় কিছু একটা দেখেন না। বাঁদী হইলেও কুলসম দেখিতে কুৎসিত নয়। সে বয়সে গুল্‌নেয়ারের অপেক্ষা দুই চার বৎসরের বড় হইলেও তাহার সহিত সে সখীর মত ব্যবহার করিত। আর এই কুলসম, গুল্‌নেয়ারের স্নেহের মধুর শক্তিতে আকর্ষিতা হইয়া তাহার গুণের বড়ই পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল।

ঘণ্টাখানেক কাল, উভয়ের সময় বাজে গল্পে ও বাজে কথায় কাটিল। কুলসম আর একবার সেই কক্ষের দরোজাটা নিঃশব্দে খুলিয়া, দালানের দিকটা ভাল করিয়া দেখিয়া আসিয়া বলিল—"সব কামরার আলো নিভিয়া গিয়াছে। এইবার তুমি তোমার বক্তব্য বল দেখি গুল্‌বিবি!"

তারপর সে দরোজাটী পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দে ভেজাইয়া দিয়া, গুলনেয়ারের পাশে আসিয়া বসিল। আর গুলনেয়ার উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে, সরফরাজের সহিত যে সব কথা হইয়াছিল, তাহার সবই কুলসমকে বলিয়া ফেলিল।

কুলসম হাসিয়া বলিল—"এই সরফরাজ নিশ্চয়ই তোমাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। আর প্রেমের আইনে এইরূপ প্রথম ভাল বাসায়, একটু যন্ত্রণা সকলেই পাইয়া থাকে। তাই সে এতবড় একটা মিথ্যা কথা বলিয়া, তোমার ও তার ভগ্নিপতিকে প্রতারণা করিয়াছে।"

গুলনেয়ার আগ্রহবশে কুলসমের হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"তাহা হইলে তোমারও মনের বিশ্বাস, যে সে একটা উপন্যাস রচনা করিয়া আমাকে কাশেমের মৃত্যুর কথা বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা করিতেছে? কিন্তু তাহাতে তাহার স্বার্থ কি?"

কুলসম হাসিয়া বলিল—"স্বার্থ না থাকিলে কি জগতে কেউ মেহনতের কোন কাজ করে। এই যে আমি তোমায় এতটা ভালবাসি, কি তুমি আমায় ভগিনীর মত স্নেহ কর, তুমি কি মনে ভাব যে এতে আমাদের স্বার্থ নাই? খুবই আছে। আমার স্বার্থ তোমার সাহচর্য্যে আমার সুখ, তোমার সহিত কথা কহিয়া আমার সুখ, তোমায় ভাল বাসিয়া আমার সুখ! কথাটা হইতেছে কি জান, এই শয়তান সরফরাজ তাহার ভগ্নির কাছে নিশ্চয়ই তোমার অপাপবিদ্ধ, উন্নত পবিত্র চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছে। অথচ সে তোমার রূপ দেখিয়া মোহিত। ধরিতে গেলে, কাশেমের প্রত্যাগমন প্রত্যাশাটি লইয়া তুমি এখন দিন কাটাইতেছ। তোমার আশার কারণ এই, যে কাশেম সাহেব এখনও প্রাণে বাঁচিয়া আছেন। আর এই

সরফরাজই তাঁর সংবাদ আনিয়াছে। তোমাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার খুব প্রবল। কাশেম যে মরিয়াছে এ সংবাদটা এখন তোমাকে কোনরকমে বিশ্বাস করাইতে পারিলেই, উহার স্বার্থ সিদ্ধির পথ অনেকটা সোজা হইয়া আসে। এ জগতে তোমার আশ্রয় স্থান নাই। এখন এই হামিদা বিবিই তোমার আশ্রয়। আমাদের শাস্ত্রেও বিধবা বিবাহ আছে। এ সকল ঘটনাবিচারে, সে এখন তোমায় একটু কায়দায় আনিবার জন্য এরূপ মতলব করিয়াছে। প্রায় তিন চারি বৎসর, আমি এ সংসারে আছি, এই শয়তানশ্রেষ্ঠ সরফরাজ খাঁকে আমি খুব ভালরূপেই চিনি।"

গুল্‌নেয়ার বলিল—"আমিও এরূপ একটা সন্দেহ করিয়া ছিলাম; আমার কাছে না হয় সে মন গড়া একটা কথা বলিল, কিন্তু জামাল খাঁর কাছে সে যাহা বলিয়াছে, তাহা উলটাইবার পথ ত নাই।"

কুলসম সহাস্যে বলিল—"খুব আছে। জামাল খাঁ খুবই স্ত্রৈণ। আর সরফরাজকে তিনি তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিবেন বলিয়া, তাঁহার পত্নীর নিকট প্রতিশ্রুত। তাহার সাতখুন মাপ। একটা কেন এরূপ হাজার হাজার মিথ্যা কথা বলিলেও, জামাল খাঁ তাহাকে কিছুই বলিতে পারিবেন না।"

গুল্‌নেয়ার সবিস্ময়ে বলিল—"বটে! কিন্তু তাহা হইলে এ কুট-চক্রী সরফরাজের হাত হইতে আমার পরিত্রাণের উপায় কি?"

কুলসম। হয় আত্মসমর্পণ! আর তা না হয় আত্মহত্যা!

গুল্‌নেয়ার কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল "শেষেরটিই আমার অবলম্বন।"

কুলসম কৃত্রিম তিরস্কারের সহিত বলিল—"তুমিত বড় হৃদয় হীন! দেখ দেখি, সরফরাজ তোমায় কত ভাল বাসে?"

এই কথা বলিয়া কুলসম একখানি মোড়ক করা পত্র গুলনেয়ারের হাতে দিয়া বলিল—"দেখ গুলনেয়ার বিবি! দুইটী স্বর্ণ মুদ্রার লোভে, আমি এই পত্রখানি তোমার কাছে পৌছাইয়া দিতে স্বীকার করিয়াছি।"

এই কথা বলিয়াই কুলসম সেই পত্রের শীলমোহর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বলিল, "এ পত্রখানি পড়িয়া দেখ দেখি।"

গুলনেয়ার পত্রখানি তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া, মুড়িয়া সুড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিল।

কুলসম তখনই দ্রুতপদে উঠিয়া গিয়া পূর্ব্বোক্ত পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া বলিল—"না না তা হইবে না। আমি নেমকহারামী করিতে পারিব না বিবি! দুইটী মোহর এখনও আমার আঁচলে বাধা। তুমি না পড়, আমি তোমাকে পড়িয়া শুনাইব।"

কুলসম পড়িতে লাগিল—"গুলনেয়ার! অদৃষ্ট বিপাকে তোমার শোচনীয় পরিণামের জন্য আমি বড়ই দুঃখিত। কিন্তু যাহাতে মানুষের হাত নাই তাহার জন্য দুঃখ করায় ফল কি? কাশেম জন্মের মত ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। তুমি যে তাহার চিন্তায় তাপদগ্ধ গুলাবের মত শুখাইয়া যাইবে, সেটাও আমি পছন্দ করি না। যে ইহলোকের পরপারে চলিয়া যায় সেত আর ফেরে না। তবে বৃথা শোক কেন? আমার মনের কথা তোমাকে খুলিয়া বলিবার জন্যই, আমি বাগানে গিয়াছিলাম। কিন্তু শীলতার অনুরোধ বলিতে পারি নাই। গুলনেয়ার! আমি তোমার জন্য উন্মাদ। তুমি আমার হও। আমি শাস্ত্র বিধানে তোমাকে ধর্ম্মপত্নী করিতে প্রস্তুত। এ ভাবে আর শান্ত স্নিগ্ধ সলিলপূর্ণ সরোবর কুলে দাঁড়াইয়া তৃষ্ণায় মরিতে পারি না। জানিও তোমার একটী কথার উপর আমার জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর

করিতেছে! আশাজনক উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম। তোমার উত্তর এই কুলসমই আমাকে আনিয়া দিবে।—"সরফরাজ।"

কুলসমের পত্রপাঠ শেষ হইলে, গুলনেয়ার একটু হাসিল। কেন তা সেই জানে। সে মলিনমুখে বলিল—"কুলসম! এখনিই এই সর্ব্বনেশে পত্রখানা আগুণে পোড়াইয়া ফেল!"

কুলসম বলিল—"ভাল লোক ত তুমি। জাননা কি, এ দুনিয়ার সকল জিনিসেরই একটা প্রয়োজন আছে। তা ভালই হউক আর মন্দই হউক। তাহা ছাড়া প্রেমিক-প্রেমিকার শাস্ত্রে, প্রেমপত্র কি পোড়াইতে আছে? এখানা আমার কাছে এখন থাক। তোমার কোন ভয় নাই। এখন এর জবাব কি দিবে তাই ভাব। বোধ হয় এর জবাব লইয়া যাইবার জন্য, তোমার কাছেও আমি দুটী মোহর ইনাম পাইব!"

গুলনেয়ার জানে, কুলসম তাহাকে খুবই ভালবাসে। সে কেবল রহস্য করিতেছে মাত্র। কিন্তু এ সময়ে এরূপ রহস্যটা, তাহার একটুও প্রীতিকর বোধ হইল না।

সে একটু বিরক্তির সহিত বলিল—"এই কি ভাই তোমার রহস্যের সময়?"

কুলসম হাসিয়া বলিল—"রহস্যের একটা এত বড় সুবিধা যখন আসিয়াছে তখন দুটো কথা বলিলামই বা গুল্? যা হোক্ ও সব বাজে কথা থাক। দেখছি—এক নূতন বিপদ তোমার সম্মুখে! এ বিপদের হাত থেকে উদ্ধারের উপায় কিছু স্থির করেছ কি?"

গুলনেয়ার কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল,—"এর উপায় আর কিছু নয়। হয় এখান হইতে গোপনে পলায়ন—আর না হয়—বিষপানে আত্মনাশ!"

কুলসম। এ দুটোর কোনটাই সদবুদ্ধি নয়। বিশেষতঃ তোমার মত সদ্‌গুণশীলার পক্ষে। জামাল সাহেব তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। এরূপভাবে না বলিয়া চলিয়া গেলে, একটা অকৃতজ্ঞতা দেখানো হয় না কি?

গুল্‌নেয়ার। সেটা ত বুঝিতেছি। কিন্তু আমি যে উভয় সংকটে পড়িয়াছি। সব কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে গেলে, সেও মস্ত একটা কলঙ্ক। আর এই সরফরাজের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলেই বা তাঁরা বিশ্বাস করিবেন কেন? আমাকেই হয়তো দোষী ঠাওরাইবেন।

কুলসম মনে মনে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিয়া, তাহার বক্ষ বসনের মধ্য হইতে একখানি শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া বলিল—"দেখ! নারীর ইজ্জত রাখিবার ভার তার নিজের হাতে। এই ধারালো ইস্পাহানী ছুরী খানা তোমার বক্ষবসনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবে। সকল সময় কাছে রাখিবার কষ্ট স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। রাত্রে যেদিন একা থাকিবে বা বাগানে যখন একা বেড়াইতে যাইবে, সেই সময়ে এখানা সঙ্গে লইও। অসহায়া রমণীর উপর যে অত্যাচার করিতে সাহসী হয়, সে স্বভাবতই কাপুরুষ! এই সরফরাজ খাঁকে আমি খুবই চিনি।"

গুল্‌নেয়ার কৃতজ্ঞ চিত্তে, সেই ছুরিকা খানি কুলসমের নিকট হইতে লইয়া, তাহার বিছানার নীচে লুকাইয়া রাখিল।

কুলসম বলিল—"দেখ! আমাদের বিবি বোধ হয়, কোন কারণে দুই তিন দিনের জন্য তাঁর পিত্রালয়ে যাইবেন। আমাকে যে তাঁহার সঙ্গে যাইতে হইবে, তাহা খুবই নিশ্চিত। কেননা, আমাকে না হ'লে তাঁর একদণ্ড চলে না। আর জামাল সাহেবও যে যাইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই দুই দিন তোমায় একটু সাবধানে থাকিতে হইবে।"

গুল্‌নেয়ার কথাটা শুনিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সে কেবলমাত্র বলিল—"আমাকেও তোমাদের সঙ্গে লইয়া চল কুলসম।"

কুলসম। ওঁর পিত্রালয় বসোরায়। সেখানে ত তুমি যাইতেই পারিবে না। ইয়াশিনের ভয় আছে—রাজদণ্ডের আসামী তুমি। নিশ্চয়ই তোমার হত্যার পর দিন, তোমার উদ্ধার ব্যাপার লইয়া সেখানে একটা লোক জানাজানি হইয়া গিয়াছে। আর জামাল সাহেব স্বয়ং তোমার উদ্ধারকারী। তিনি তোমায় লইয়া যাইতে সাহস করিবেন কেন?

বসোরার উপর গুলনেয়ারের একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। আর কুলসম যে ভয় দেখাইল, তাহাও সে অমূলক বোধ করিল না। কাজেই সে বসোরা যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করিল।

তারপর সে মনে মনে বলিল—"কুলসম্ সত্যই বলিয়াছে, যে নারীর ইজ্জত রক্ষার ভার তার নিজের উপর। আমার বোধ হয় এই সরফরাজ খাঁ ইয়াশিনের মত অত হৃদয়হীন, অত নীচ নয়।"

এই সব কথা মনে মনে ভাবিয়া, সে কুলসমকে বলিল—"খোদা আমার সহায়। অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই। সেই করুণাময় বিধাতার উপর কখনও একান্তভাবে বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করি নাই। এবার করিয়াই দেখিনা কেন—কিসে কি হয়।"

কুলসম দুষ্টামি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কই গো! আমাদের খাঁ সাহেবের চিঠির জবাব কই?"

গুল্‌নেয়ার মৃদু হাসিয়া বলিল—"তোর কবরের পাশে এই চিঠির জবাব রাখিয়া আসিব। রঙ্গ দেখ্।"

কুলসম বলিল—"এখন খুঁজিয়া দেখি গে,—কোথায় তুমি আমার কবর

খুঁড়িয়া রাখিয়াছ। সেখানে যদি কিছু না পাই, তাহা হইলে আমার মনগড়া একটা জবাব খাঁ সাহেবকে দিব।

এই ভাবেই সেদিন উভয়ের কথা বার্ত্তা শেষ হইল।

তৎপরদিন প্রভাতে একটু নির্জ্জনে কুলসমকে দেখিতে পাইয়া, সরফরাজ খাঁ বলিল—"কি কুলসম! আমার কতদূর কি করিলে?"

কুলসম হাসিয়া বলিল—"সাহেব! অত ব্যস্ত হইবেন না। ব্যাপারটা বড় সহজ নয় ত। আর যে সে লোকের সঙ্গেও কাজ নয়। যতদূর বুঝিয়াছি—কাশেম জীবিত আছে, এই সংবাদটা গুল্‌বিবি খুব ধ্রুব সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। এ বিশ্বাসটা না গেলে—তাহাকে দমাইয়া দেওয়া বড় সহজ কাজ নয়। কাশেমের সংবাদ ত আপনিই আনিয়াছেন? আচ্ছা বলুন দেখি সাহেব! সত্যই কি কাশেম জীবিত? আমাকে একটু বেশী বিশ্বাস না করিলে আমি আপনার কাজ করিব কিরূপে?"

সরফরাজ খাঁ বলিল—"কুলসম! তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলিব না। কাশেম কারাগার হইতে পলাইয়াছে এটা ষোল আনা সত্য। তবে তারপর সে কোথায় কি ভাবে আছে, বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে, তাহা ত আমি জানিনা। জানিবার উপায়ও নাই। এই জন্যই ত আমি একটা উপকথা শোনাইয়া, গুল্‌নেয়ারকে বিশ্বাস করিবার অবসর দিয়াছি, যে কাশেম সত্য সত্যই মৃত।" এই সংবাদটী কৌশলে সংগ্রহ করিবার জন্যই কুলসম এইরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছিল। সে এই সঙ্গে এই কথাটা বুঝিল এই সরফরাজ খাঁ মিথ্যাবাদী, আর নিজের এক অতি নীচস্বার্থ সিদ্ধির জন্য গুল্‌নেয়ারের প্রতি হীনোচিত নিষ্ঠুরতা করিতেছে।

মুহূর্ত্তকাল মাত্র কি ভাবিয়া কুলসম বলিল—"তা আপনি তাহাকে

যাহাই রচিয়া বলুন না কেন—সে কাশেমের মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করে নাই। সাহেব! আমার কথা শুনুন। অত ব্যস্ত হইবেন না। এক দিন না একদিন এই উড়ো পাখী আপনার জালে পড়িবে। আর আমিও ত এটা ঘটাইতে পারিলে, আপনার কাছে দুই শত স্বর্ণমুদ্রা এনাম পাইব। এ আশাও ত আপনি আমায় দিয়াছেন। গরীব দুঃখী, দাসী বাঁদি আমরা, টাকায় আমাদের বড় প্রয়োজন—আর সেই টাকা গতর না খাটাইয়া যদি ফাঁকতালে উপায় হয়, তাহা হইলে তার মধুরতা আরও বেশী।"

সরফরাজ খাঁ তাঁহার শ্মশ্রুর মধ্যে মৃদুভাবে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে বলিল—"তা সে আমার পত্রের "হাঁ—কি—না" একটা জবাব দিতেও ত পারিত। তুমি কি তাকে আমার সে পত্র খানি দাও নাই?

কুলসম মৃদু হাস্যের সহিত বলিল—"রাজি কিম্বা গররাজি, এটার মীমাংসা না হইলে ত সাহেব! হাঁ—না জবাব পাওয়া যায় না। সে এখনও এ দুটোর কোন একটারও সীমার মধ্যে আসে নাই। এ অবসর হইলেই সে জবাব দিবে। আর এ সব ব্যাপারে মেয়ে মানুষের লিখিত পড়িত কোন কিছু করা, এই সব গোপনীয় পত্রের জবাব প্রভৃতি দেওয়া, যে একটা বিপদের কাজ। আপনি আমায় পনেরটী দিন সময় দিন, এর মধ্যে সব কাজ শেষ করিয়া দিব।"

কুলসমের কথার ভঙ্গীতে সরফরাজ খাঁ, খুবই বিশ্বাস করিল যে কুলসম যাহা বলিতেছে, তাহা মিথ্যা নয়।

সে কুলসমের কথায় খুব একটা দৃঢ়তর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বলিল—"ভাল! দেখা যাক্ তোমার দৌড় কতদূর! তোমার আশাবাক্যে নির্ভর করিয়া আমার জীবন সুখে কাটিবে এটা যেন মনে থাকে।"

কুলসম বলিল—"সাহেব! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন! কুলসমকে যে সে বাঁদী ভাবিবেন না।"

এইকথা বলিয়া, একটু মৃদু হাসিয়া কুলসম তাহার কাজে চলিয়া গেল।

(১৮)

অনাথা, নিরাশ্রয়া গুল্‌নেয়ার অসম্ভাবিত উপায়ে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার পাইয়া, আর এই স্নেহবান জামাল খাঁ ও তাঁহার পত্নীর আশ্রয়ে থাকিয়া তাহার দুঃখের দিনগুলি একটু স্বচ্ছন্দের সহিত কাটাইতেছিল। কিন্তু শীতের সূর্য্যের মত, তাহার সে আরামের দিনগুলি যেন অতি শীঘ্রই অস্ত হইয়া গেল।

কুলসমের সহিত সরফরাজ খাঁর পরদিন যে সব কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার সবই সে তাহার হিতকারিণী সঙ্গিনী কুলসমের নিকট শুনিয়াছিল, আর মনে মনে কুলসমের প্রখর বুদ্ধির, অনেক প্রশংসা করিয়াছিল।

উল্লিখিত ঘটনার দুই দিন পরে, জামাল খাঁ তাঁহার পত্নীকে পিত্রালয়ে পৌছিয়া দিতে গেলেন। কুলসম ও তাঁহাদের সঙ্গে গেল।

যাইবার সময় জামাল খাঁ গুল্‌নেয়ারকে বলিয়া গেলেন—"মনে ভাবিয়াছিলাম, বসোরায় দুই চারি দিন কাটাইয়া আসিব। কিন্তু তোমার জন্য সে সংকল্প ত্যাগ করিলাম। আমি হামিদাকে সেখানে পৌছাইয়া দিয়াই চলিয়া আসিব। দুই একটা দিন কেবল তোমাকে একলা এখানে থাকিতে হইবে। যে সকল গোপনীয় কারণে আমি তোমাকে বসোরায় লইয়া যাইতে অনিচ্ছুক তাহাত তুমি জান। এই দুটা দিন চুপ করিয়া থাক। কোন ভয় নাই তোমার মা!"

গুল্‌নেয়ার কথাটা শুনিয়া প্রথমে মনে বড় ভয় পাইল। তার পর যখন সে দেখিল, মোটে একটী রাত্রি আর একটী দিন বইতো নয়! এর জন্য বিধাতার উপর নির্ভর করিয়া থাকাই ভাল।

এই ভাবিয়া সে বলিল—"ভাল! তাহাই হইবে। তবে আপনি কোনমতেই সেখানে এর বেশী দেরী করিবেন না।"

হামিদা বিবি হাসিয়া বলিলেন—"তা উনি দেরী করিতে চাহিলে, আমি করিতে দিব কেন মা?"

তাঁহারা মধ্যাহ্নে বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন। সেই বাড়ীর মধ্যে রহিল, গুল্‌নেয়ার, সরফরাজ খাঁ, আর একজন বাঁদী ও একজন গোলাম।

সেই বাড়ী হইতে কুলসম ও হামিদা বিবি চলিয়া যাইবার পর হইতে গুল্‌নেয়ারের মনটা বড়ই ছম্‌ছম করিতে লাগিল। কি একটা অব্যক্ত ভয়ে, তাহার হৃদয় অভিভূত হইল। ভয় আর কাহারও জন্য নয়—এই সরফরাজের।

এজন্য সে প্রাতে বা অপরাহ্ণে বাগানে বেড়াইতে যাইত না। দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া, কখনও বা একদৃষ্টে পার্শ্ববাহিনী নদীর দিকে চাহিয়া থাকিত, আবার কখনও বা সেই নদীর পাশ ধরিয়া যে ক্ষুদ্র রাজপথ সরাসর উভয় দিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহারই বিরল জনস্রোত লক্ষ্য করিত।

দ্বিতীয় দিনের উজ্জ্বল মধ্যাহ্নে, সে বাতায়ন পথ উন্মুক্ত করিয়া একদৃষ্টে রাজপথের দিকে চাহিয়া আছে—এমন সময়ে দেখিল, একজন নীলবসন পরিহিত দরবেশের চারিধার ঘিরিয়া একটী ক্ষুদ্র জনতা চলিয়াছে, আর সেই দরবেশ আকাশের দিকে দুই হাত তুলিয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে।

"মুস্কিল কা ইস্ দুনিয়ামে সব রাখো ধরম কি নিশানা।
কব্ আখের হোয়েগা, দমছুটেগা, উনকা নাহি ঠিকানা॥"

গুল্‌নেয়ার দেখিল—দরবেশ গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে, কিন্তু সে কোথাও দাঁড়াইতেছে না। কাহারও নিকট ভিক্ষাও চাহিতেছে না। তাহার যেন কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, ভিক্ষার কামনা নাই, কাহারও দান গ্রহণ করিবার স্পৃহাও নাই। কেন না—কেহ কিছু দিতে আসিলে তাহা সে বিনয়ের সহিত প্রত্যাখ্যান করিতেছিল।

রাজপথে এরূপ সন্ন্যাসী দরবেশের আবির্ভাব ব্যাপার, সে দেশে নূতন নয়। জামাল খাঁ দরবেশের গান শুনিতে খুবই ভাল বাসিতেন। এজন্য রাজপথ হইতে দরবেশদের নিজের বাড়ীতে আনাইয়া গান শুনিতেন, আর তাহাদের প্রচুর পুরস্কার দিতেন। আর গুল্‌নেয়ারও তাহার এ বাড়ীতে আসার পর, জামাল খাঁর অভ্যাগত এই শ্রেণীর দরবেশের মুখে কয়েকবার গানও শুনিয়াছিল।

কিন্তু এই নবাগত দরবেশের কণ্ঠ স্বর যে অতি মিষ্ট। তাহার গান গাহিবার ভঙ্গীও অতি সুন্দর। আর এই ধরণের গান শুনিতে ও গাহিতে ভালবাসিত যে একজন। গানটীর আগাগোড়া যে তাঁহারই মুখে শুনা। সে মনে মনে বলিল—"এ জানা গান—আমার প্রাণকে এমন করিল কেন? গানের সুরে, কথায়, গাহিবার ভঙ্গীতে, আমার প্রাণে সহসা এতটা চঞ্চলতা আসিল কেন?"

গুল্ তার পর মনে ভাবিল—"তিনি এই গানটী জানিতেন বলিয়া কি দুনিয়ায় আর কেহ তাহা জানিবে না। সাধু সন্ন্যাসীর মুখ দিয়াই ত এ ধরণের ভক্তিপূর্ণ গানের প্রচার চারিদিকে হয়। তিনিও ত এক দরবেশের নিকট হইতে এই গানটী শিখিয়াছিলেন।"

দরবেশ সাহেবও ঠিক এই সময়ে, যে বাতায়ন সম্মুখে গুল্‌নেয়ার দাঁড়াইয়া,

ছিল—সেই স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া, তাহার গানটী আরও একবার গাহিল। এবার তাহার দৃষ্টি নীলাকাশের দিকে নয়—গুল্‌নেয়ারের অধিকৃত গবাক্ষের দিকে।

গুল্‌নেয়ার তাহা দেখিতে পাইয়া যেন একটু সংকুচিত হইয়া, গবাক্ষের একটী কপাট বন্ধ করিয়া, তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইল। দরবেশ সেই মুহূর্ত্তেই সঙ্গীত বন্ধ করিয়া, সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

গুল্‌নেয়ার তাহার এইভাবে আত্মগোপন ব্যাপারে, দরবেশের সহসা অন্তর্ধান দেখিয়া, যেন একটু অনুতপ্ত ও সংকুচিত হইয়া মনে মনে বলিল—"হয় তো উনি আমাদের বড় বাড়ী দেখিয়া কোন কিছু বেশী প্রত্যাশা করিয়া আমার অধিকৃত জানালার দিকে চাহিয়াছিলেন। হায়! আমি চাকরদের হাত দিয়া তাঁহাকে দুইএকটী মুদ্রা পাঠাইয়া দিলাম না কেন?"

এক এক সময়ে, অতি সামান্য ব্যাপারে, নারীর মন খুবই বিচলিত হইয়া উঠে। এই সামান্য ঘটনাটী, গুল্‌নেয়ার যতই মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল, ততই তাহার প্রাণের ভিতর একটা অনুতাপ ও ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

সে অতি চঞ্চল হৃদয় লইয়া, তাহার নিজের কক্ষে চলিয়া গেল। দ্বারটী ভেজাইয়া দিয়া, শয্যায় শুইয়া নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে, তন্দ্রাভিভূত হইল।

গুল্‌নেয়ারকে ছাড়িয়া একবার আমাদের এই দরবেশের অনুসরণ করিতে হইবে।

দরবেশ যখন দেখিল, জানালাটী বন্ধ করিয়া তৎপার্শ্ববর্ত্তী যুবতী কক্ষমধ্যে চলিয়া গেল, তখন সে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"হাঁ—এত

দিনের পর আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। এইবার তুমি যাও কোথা? আমার চাতুরী সৃজিত এই ছদ্মবেশের ভিতর দিয়া, তুমি আমায় চিনিতে না পারিলেও আমি যে তোমাকে চিনিয়াছি।"

দরবেশ সহসা গান বন্ধ করিয়া অদূরবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করিল দেখিয়া, জনতাও ক্রমশঃ বিরল হইয়া পড়িতে লাগিল।

দরবেশ মসজেদের জানালার মধ্য হইতে যখন দেখিল—রাজপথে আর কোন লোক নাই, আর সেই ক্ষুদ্র পল্লীর ক্ষুদ্র রাজপথ, তাহার অবর্ত্তমানে খুব শীঘ্রই জনশূন্য হইয়াছে, তখন সে মসজেদ হইতে বাহির হইয়া নিকটস্থ নদীতীরের এক নিভৃত স্থানে উপস্থিত হইল।

সেই সৈকতভূমির একস্থানে কতকগুলি বড় বড় পাথর পড়িয়াছিল। সে পাথরগুলি সেকালের একটা বড় পাহাড়ের ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশ।

এই স্থানটী খুবই নির্জ্জন। এখানে কেউ যদি আত্মগোপন করে, রাজপথ হইতে তাহাকে দেখা যায় না।

দরবেশের সঙ্গে একটী ক্ষুদ্র পুঁটুলী ছিল। তার মধ্যে ভদ্রলোকের পরিবার উপযোগী পোষাক পরিচ্ছদ।

দরবেশ ছদ্মবেশ সহায়তায় এক ওমরাহ শ্রেণীর লোকে পরিবর্ত্তিত হইল। তৎপরে সে অদূরবর্ত্তী এক কাফিখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, বেলাটী শেষ করিয়া ফেলিল।

সন্ধ্যার পর সে পুনরায় রাজপথে আসিয়া পৌছিল। তখন সূর্য্য পশ্চিমাচলে ডুবিয়াছেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে নামিয়া সেই ক্ষুদ্র নগরকে গ্রাস করিতেছে।

এই পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তি দরবেশ, পথের অপর দিকে দাঁড়াইয়া জামাল খাঁর

বাড়ী হইতে কোন দাস দাসী বাহির কি না, তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে এই ছদ্মবেশী দেখিল, এক নিম্ন শ্রেণীর বাঁদী সেই বাটী হইতে বাহির হইয়া রাজপথে নামিয়া বাজারের পথ ধরিয়াছে। বোধ হয়, নিকটস্থ বাজারেই তাহার প্রয়োজন। একটা গলিপথ ধরিয়া গেলে বাজারটী খুব কাছে পড়ে। এজন্য সে এই সহজ পথটাই ধরিয়াছে।

দরবেশ দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। তারপর এক নির্জ্জন স্থান দেখিয়া সহসা তাহার সম্মুখীন হইয়া বলিল—"তুমি একটু দাঁড়াও ত বিবি! তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

বিবি সম্বোধনে, এই বাঁদী যেন একটু আনন্দ উপভোগ করিল। সে প্রসন্ন মুখে সেই আগন্তুকের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"মেজাজ্ সরীফ্ জনাব! আমাকে কি আপনি কোন কথা জিজ্ঞাসাকরিতে চান?"

আগন্তুক। বলিতে পার—অই লাল রঙ্গের বাড়ী কার?

বাঁদী। জনাব! এ মোকাম জামাল খাঁর। আমি তাঁরই বাড়ীর বাঁদী।

আগন্তুক। ভাল! এই নাও তোমার এনাম্।

একটী চকচকে স্বর্ণ মুদ্রা বাহির করিয়া, এই আগন্তুক, সেই বাঁদীর হাতে দিল। গরীব বাঁদী সেলামের উপর সেলাম করিয়া বলিল—"বোধ হয় হুজুর কোন ছদ্মবেশী ওমরাহ। তা আমি আমাদের গুলনেয়ার বিবির একটা জরুর ফরমায়েস লইয়া, বাজারে যাইতেছি। আপনি এখানে একটু দাঁড়ান। আমিই আপনাকে সঙ্গে লইয়া, ঐ বাড়ীতে যাইব।"

গুল্‌নেয়ারের নাম শুনিবামাত্রই লোকটা চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"কোন্ গুল্‌নেয়ার? কাশেম সাহেবের কবিলা?"

বাঁদী সপ্রতিভ ভাবে বলিল—"জনাব তাহা হইলে আমাদের বাড়ীর

সকলকে চেনেন দেখিতেছি। হাঁ—এই গুলনেয়ার বিবি, কাশেম সাহেবের কবিলা। আমাদের সাহেব তাঁহাকে কবর হইতে তুলিয়া বাঁচাইয়াছেন। আর নিজের মেয়ের মত মানুষ করিতেছেন। তা—জামাল সাহেবের সঙ্গে ত আপনার আজ দেখা হইবে না।

আগন্তুক। কেন ?

বাঁদী। আমার মনিব আর তাঁর বিবি, বসোরায় তাঁদের কুটুমবাড়ী গিয়াছেন।

আগন্তুক। বাড়ীতে তা'হলে আর কোন স্ত্রীলোকই নেই।

বাঁদী। ঐ গুলনেয়ার বিবিই এখন সংসারের কর্ত্রী। তিনি আছেন আর বান্দা বাঁদীরা আছে।

"আচ্ছা! তুমি বাজারের কাজ সারিয়া শীঘ্র ফিরিয়া এস। আমি এইখানেই তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি"—এই কথা বলিয়া সেই আগন্তুক বৃক্ষতলে গিয়া দাঁড়াইলেন।

এই গরীব বাঁদী অযাচিত ভাবে একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া, সেই আগন্তুককে উপরি উপরি গোটা দুই সেলাম করিয়া বলিল—"জনাব! একটু অপেক্ষা করুন এইখানে। আমি এলুম বলে।" এই কথা বলিয়া বাঁদী সেস্থান ত্যাগ করিল।

বাঁদী চলিয়া গেলে—সেই আগন্তুক মনে মনে বলিল—"আর কেন ? তোমার পূর্ণ পরিচয় ত পাইয়াছি। এই দরবেশের ছদ্মবেশ ধরিয়া আশাতীত ফললাভ করিয়াছি। এই জন্য কথায় বলে—"ধর্ম্মের ভাণ করিলেও কিছু না কিছু ফল হয়।" আজ রাত্রে যে উপায়ে পারি তোমার সঙ্গে দেখা করিব। বাটীতে যখন কেহই নাই তখন এসম্বন্ধে আমার পূর্ণ সুযোগ।" এই কথা বলিয়া সেই আগন্তুক অন্য পথে চলিয়া গেল।

(১৯)

সরফরাজ অনেক চেষ্টা করিয়াও, গুল্‌নেয়ারের রূপের ছবি তাহার মনের ভিতর হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিল না। সে এক একবার মনটাকে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া, পাপপথ হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা করে, আর সেই মুহূর্ত্তেই শয়তান তাহাকে প্রলোভিত করিয়া, তাহার সে দৃঢ়তার সংকল্পকে দূরে ভাসাইয়া দেয়।

সরফরাজ খাঁ জানে—যে বাড়ীতে কেহ নাই। তবুও সে অনেক কষ্টে এই বিধি প্রেরিত সুযোগ উপেক্ষা করিয়া, সহিষ্ণুতায় বুক বাঁধিয়া, তাহার নিরাশ সুখ স্বপ্নের ব্যর্থ দিনগুলি কাটাইতেছিল। কেননা—সে জানিত, সহসা গুলনেয়ারের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিলে, জামাল সাহেব হয়ত রাগ করিতে পারেন। কেননা—তিনি এই গুল্‌নেয়ারকে কন্যার মতই পালন করিতেছেন। এজন্য কুলসমের কথায় বিশ্বাস করিয়া সে সহিষ্ণুতা অবলম্বনই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিল।

চিত্তের বিষণ্ণতা দূর করিবার জন্য, সরফরাজ নিজের কক্ষের দ্বারটী ভেজাইয়া দিয়া সেরাজি পান করিতেছিল। কয়েক পাত্র সুরা উদরস্থ হইবার পর, তাহার চিত্তের বিমর্ষ ভাবও দূর হইল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা পৈশাচিক সাহস দেখা দিল।

এই সুযোগে শয়তান তাহার কাণে কাণে বলিল—"সরফরাজ খাঁ! গুল্‌নেয়ার এই পুরী মধ্যে এখন একা। আজই তোমার উপযুক্ত সুযোগ। সুন্দরী চিরদিনই বীর ভোগ্যা। নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে কখনই তোমার কামনা সফল হইবে না। তুমি বাসনার আগুণে এই ভাবেই পুড়িয়া মরিবে। সহজে

না হয় বল প্রয়োগ কর। তাহাকে এই সুযোগে এবাড়ী হইতে সরাইয়া ফেল। সে নিশ্চয়ই তোমারই হইবে।"

শয়তানের প্ররোচনায়, সরফরাজের সুপ্ত হীনপ্রবৃত্তি সমূহ পুনরায় পূর্ণরূপে শক্তি সঞ্চয় করিল। সে আবার একপাত্র মদিরা পান করিল। তারপর তাহার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া, সে গুল্‌নেয়ারের কক্ষের দিকে অগ্রসর হইল।

সে ভাবিল, তাহার সেদিন পরম সুযোগ উপস্থিত। কেননা সে সবিস্ময়ে দেখিল—গুল্‌নেয়ার শয়ন কক্ষের দ্বার বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। সেই দ্বারটী খালি ভেজান আছে।

সাহস সঞ্চয় করিয়া সে অতি সন্তর্পণে দ্বার ঠেলিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ফুটন্ত কমলতুল্য গুল্‌নেয়ার সেই শুভ্রশয্যা আলো করিয়া ঘুমাইতেছে।

সে বহুক্ষণ ধরিয়া স্থির দৃষ্টিতে সেই অপূর্ব্ব, অনিন্দ্য, রূপমাধুরী দেখিল। সুকৃষ্ণ অবেণীসম্বন্ধ কেশপাশ, নিদ্রালসময়, সুরমারঞ্জিত বিশাল নেত্র, কুসুমকোমল বাহুযুগ—ধীরে স্পন্দিত সুকোমল উরস দেশ। আর সেই সুন্দর মুখে, কক্ষ মধ্যস্থ দীপের আলো পড়ায়, সে অপূর্ব্ব রূপ যেন পূর্ণমাত্রায় মাধুরীময় হইয়াছে। ষোলকলা চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃও যেন সে রূপপ্রভার কাছে পরাভূত।

আবেগভরে, সরফরাজ বলিয়া উঠিল—"এতরূপ তোমার? এত সুন্দরী তুমি? ওঃ—গুল্! ওঃ—গুল্‌নেয়ার!"

কথাগুলি সে একটু উচ্চৈঃস্বরেই বলিয়াছিল। কথার শব্দে গুল্‌নেয়ারের চঞ্চল নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে সচকিতভাবে, শয্যার উপর হইতে নামিয়া

আসিয়া নীচে দাঁড়াইয়া বলিল—"এ কি? সরফরাজ সাহেব? আপনি এ সময়ে আমার কক্ষে কেন? লোকে দেখিলে কি ভাবিবে?"

সরফরাজ বলিল—"দেখিবার মত লোক ত কেহই এ বাড়ীতে নাই। কে দেখিবে গুলনেয়ার! তুমি আর নিষ্ঠুর হইও না। ঐ সমুজ্জল দীপ পার্শ্বে গিয়া একবার দাঁড়াও। আমি প্রাণ ভরিয়া তোমার অই অনিন্দ্য রূপ মাধুরী দেখিয়া, নয়ন সার্থক করি।

গুলনেয়ার সরোষে বলিল—"ছিঃ! একথা বলিতেও আপনার মুখে বাধিল না। আমি না আপনাদের আশ্রিতা? এই নিস্তব্ধ গভীর নিশীথে, অতি দুষ্টের মত, আমার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া এ ছার রূপ দেখিতে আসিয়াছেন! একথা বলিতেও কি আপনার একটু লজ্জা বোধ হইল না সাহেব?"

সরফরাজ তখন নেশার ঝোঁকে হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়াছে। সে সম্মুখের দিকে আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিল—"গুলনেয়ার! গুলনেয়ার! এখনও আমার কথা শোন! আর আমি তোমার ও মলিন মুখ দেখিতে পারি না। আর এ ভাবে জ্বলিতে পারি না! জানিনা কি কুক্ষণেই আমি তোমাকে দেখিয়াছিলাম। তুমি আমার হও! গুলনেয়ার! জামাল সাহেবের এ অতুল ঐশ্বর্য্য একদিন আমারই হইবে। আমায় পতিত্বে বরণ কর। নিজে সুখী হও—আমাকেও সুখী কর।"

গুলনেয়ার রুষ্ট ভাবে বলিল—"আমার স্বামীর যে অতুল ঐশ্বর্য্য, আমি তৃণের মত উপেক্ষা করিয়া পিছে ফেলিয়া আসিয়াছি—তার কাছে আপনার ঐশ্বর্য্য ত দাঁড়াইতেই পারে না। আপনার এমন ঐশ্বর্য্যে আমি পদাঘাত করি। যান, আপনি এ কক্ষ হইতে এখনি চলিয়া যান।"

সরফরাজ এ কথায় রাগিল। একটু দৃঢ়তার সহিত বলিল—"যদি আমি না যাই !"

গুল্‌নেয়ার। তাহা হইলে আমি বাদীদের চীৎকার করিয়া ডাকিব।

সরফরাজ। সে আশায় নিরাশ হও। তারা সবাই আজ বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। আর তাই বুঝিয়াই, আমি এই গভীর নিশীথে তোমার দ্বারে কৃপা ভিখারি হইয়া আসিয়াছি।

গুল্‌নেয়ার বলিল—"সাহেব! এখনও প্রকৃতিস্থ হোন। প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করিয়া নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করুন। ছার এ রূপ! চিরদিন কি এ রূপ থাকিবে? আপনি আমার পিতৃতুল্য। হামিদা বিবির সহোদর আপনি! আপনাকে স্বেচ্ছায় কোন অপমান আমি করিতে পারিব না। আপনার পায়ে ধরিয়া মিনতি করিতেছি—এখনই এ কক্ষ ত্যাগ করুন।"

সরফরাজ খাঁ ঘূর্ণিত লোচনে বলিল—"ও সব কথায়, আজ আব ভুলিতেছি না সুন্দরি! এই সরফরাজ আজ সর্ব্ববিধ পাপের জন্য শয়তানের দাসত্ব স্বীকার করিয়া, এই গভীর রাত্রে তোমার কক্ষমধ্যে আসিয়াছে। তুমি সহজে আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত না হও—আজ রাত্রেই তোমায় বলপূর্ব্বক এখান হইতে সরাইয়া লইয়া আমার বাগানে রাখিব। আর কাল সকালে, তোমায় দামাস্কসে চালান দিব। এই আমার দৃঢ় সংকল্প! এই আমার স্থির প্রতিজ্ঞা! নিজের হিত যদি চাও, আর আমায় কষ্ট দিও না আর আমায় রাগাইও না।"

এই কথা বলিয়া সরফরাজ গুলের দিকে, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া আরও একটু অগ্রসর হইল। গুলনেয়ার আরও দূরে সরিয়া গিয়া বলিল—"খোদা! রক্ষা কর প্রভু! কোথায় প্রিয়তম কাশেম!"

সরফরাজ বিদ্রুপের সহিত জড়িত স্বরে বলিল—"খোদা ত তোমার হুকুমের চাকর নন। আর কাশেম—সেও ত মরিয়াছে। সেও কবর হইতে উঠিয়া আসিয়া তোমায় বাঁচাইতে পারে না!"

"না—কাশেম মরে নাই!" এই কথা বলিয়া আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত কে একজন, সেই কক্ষমধ্যে দ্রুতবেগে প্রবেশ করিয়া ভীমগর্জ্জনে বলিল—"না—কাশেম মরে নাই! তোর মত মহাপাপীকে শাস্তি দিবার জন্য সে জাহান্নাম হইতে ফিরিয়া আসিতে পারে। পরলোকে আর ইহলোকে যে একটা খুব নিকট সম্পর্ক আছে, ভুলিয়া গিয়াছিস কি নরাধম!"

এই কথা বলিয়াই সেই আগন্তুক, ব্যাঘ্রবৎ লম্ফনে সরফরাজের উপর গিয়া পড়িল। এই সবল আগন্তুকের অতর্কিত আক্রমণের বেগ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, সরফরাজ ভূপতিত হইল। পড়িবার সময় খাটের বাজুর আঘাত লাগিয়া তাহার মাথা ফাটিয়া গিয়া, শোণিত ধারা বাহির হইতে লাগিল। সে ভয়ে ও অতিরিক্ত শোণিত পাতে মূর্চ্ছিত হইল।

গুলনেয়ার সেই আগন্তুকের চরণতলে বসিয়া বলিল—"কে আপনি মহাপুরুষ! আজ আমার নারীসম্মান রক্ষা করিলেন?"

সেই আগন্তুক তখনই তাহার মুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া বলিল—"দেখ দেখি গুল্—কে আমি?"

গুলনেয়ার তখনি এই আগন্তুককে চিনিতে পারিয়া, আবেগভরে চীৎকার করিয়া বলিল—"এ কি—এ কি? তুমি? কাশেম? আমার জীবনাধিক?"

কাশেম বলিল—"গুল্! আজ খোদা তোমায় রক্ষা করিয়াছেন। এখানে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করা উচিত নয়। এস আমার সঙ্গে।"

কাশেম অগ্রসর হইল। গুল্ তাহার পশ্চাৎবর্ত্তিনী। উভয়ে সেই গভীর নিশীথে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল।

কাশেম ইতিপূর্ব্বেই একখানি শকট স্থির করিয়া রাখিয়াছিল।

কাশেম বলিল—"নদীতীরে নৌকা আছে। আজ রাত্রেই এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। এখান হইতে দামাস্কস বেশী দূর নয়। প্রভাতের পূর্ব্বেই আমরা সেখানে পৌঁছিব। নৌকায় উঠিয়া তোমায় সব কথা বলিব।"

শেষ কথা !

কাশেম প্রহরীকে উৎকোচ দিয়া একটী উখা সংগ্রহ করে। এই উখাটি সংগ্রহ করিতে, তাহাকে পুরস্কার স্বরূপ তাহার নিজের হাতের অঙ্গুরীয়টী, যাহার মূল্য এক সহস্র টাকা—তাহা সেই প্রহরীকে দিতে হইয়াছিল।

এই প্রহরীর ভাই-ই ইয়াশিনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। কাশেম যে দিন পলায়ন করে, তার দুই দিন পূর্ব্বে সে এই বেদুইন দস্যুকে ইয়াশিনের নিকট পাঠায়। সত্যই সে তাহার পত্র খানি নিজের শোণিত বিন্দু দিয়া লিখিয়া দিয়াছিল। এই পত্রে সে ইয়াশিনের নিকট শেষ বিদায় লইয়াছিল। তার মনে তখনও একটা আশা ছিল—যে ইয়াশিন নিশ্চয়ই এই দস্যুকে তাহার প্রয়োজনানুরূপ অর্থ প্রদান করিবে। তাহাতে তাহার সহজে মুক্তিলাভের পথ হয়তো আরও পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

কিন্তু বেদুইন দস্যু ফিরিয়া গিয়া কাশেমকে দেখিতে পায় নাই। তাহার এক সহোদরকে কারাকক্ষের প্রহরীরূপে রাখিয়া যায়। কাশেম ইহাকেই তাহার হাতের শেষ বহুমূল্য অঙ্গুরীয়টী দিয়া, একখানি উখা সংগ্রহ করে। আর সেই উখার সহায়তায় জানালার গরাদে কাটিয়া পলায়ন করে।

ইহার পর সেই বেদুইন দস্যু ফিরিয়া আসিয়া যখন দেখিল, কাশেম পলাইয়াছে, আর দস্যু সর্দ্দার কয়েদীর এই পলায়ন ব্যাপার লইয়া, একটা মহা হুলস্থূল উপস্থিত করিয়াছে, তখন সেই বেদুইন দস্যু আত্মপক্ষ সমর্থনার্থে অনেক কথা বলিলেও সর্দ্দার তাহাদের দুই ভ্রাতাকেই কাশেমের পলায়নের সহকারী ভাবিয়া কারাবদ্ধ করে।

ইহার কয়েক দিন পরে, সেই দস্যুপল্লীর পার্শ্ববাহিনী একটী নদীতে, একটা লাস ভাসিতেছে—ইহা দেখিয়া, দস্যুপতির অনুচরেরা তাঁহার নিকট সংবাদ আনয়ন করে। সে লাস তখন দুর্গন্ধময় ও বিকৃত। দস্যুপতি সিদ্ধান্ত করিলেন—"এ লাস কাশেমের না হইয়া যায় না। সে নিশ্চয়ই সন্তরণ দিয়া নদীপার হইতে গিয়া, এইভাবে ডুবিয়া মরিয়াছে।"

এ লাস প্রকৃতপক্ষে কাশেমের নহে। লাশটী উঠাইয়া আনিয়া পরীক্ষা করিলে তখনই তাহা প্রমাণ হইয়া যাইত। কিন্তু সেরূপ না করায় কাশেমের নিরাপদ পলায়নের যথেষ্ট সুবিধাই হইল।

অনেক কষ্টে, বহুদিন পর্য্যটনের পর, কাশেম একদিন নিশীথের অন্ধকারে শরীর ঢাকিয়া, তাহার বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইল।

সে সবিস্ময়ে স্পন্দিত হৃদয়ে দেখিল—তাহার বাড়ীর বাহিরের দিকে তালা লাগানো রহিয়াছে। দ্বিতলের কক্ষগুলি অন্ধকারময়। সে মৃদুভাবে দ্বারে করাঘাত করিল। অনুচ্চস্বরে ভৃত্যদের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল—কিন্তু কেহই সাড়া দিল না, বা দ্বার খুলিয়া দিল না।

কাশেম চঞ্চল হৃদয়ে এক ক্ষুদ্র প্রাচীর উল্লম্ফন করিয়া ইয়াশিনের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন রাত্রি প্রায় বারটা।

গুলনেয়ারের উপর প্রতিহিংসা লইতে গিয়া, ইয়াশিন যে অনর্থ ঘটাইয়াছিল, তাহার জন্য তখন সে বড়ই নিরাশা পীড়িত—খুবই মর্ম্মাহত। গুলনেয়ারের শোচনীয় মৃত্যু-স্মৃতি তখনও তাহাকে প্রেতের মত অনুসরণ করিতেছে। গুলনেয়ার যে সমাধির মধ্য হইতে, অদ্ভুত উপায়ে জীবন ফিরিয়া পাইয়াছে, সে সংবাদও সে জানে না। সে কেন—নগরের কেহই তাহা জানে না। জানে কেবল সর্দ্দার প্রহরী ও তার বিশ্বস্ত অনুচর দুইজন।

সে দিন রাত্রে খুব মেঘ করিয়াছিল। তাড়াতাড়িতে কাজ সারিয়া প্রহরীগণ, সে রাত্রে বধ্যভূমি ত্যাগ করে। পর দিন অতি প্রত্যুষে, একটা কৌতূহল বশে, সর্দ্দার প্রহরী সেইস্থানে আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, যে কবরের মাটী ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত! লাস—তাহার মধ্যে নাই। পাছে তাহার উপর কোন দায়িত্ব পড়ে, এজন্য সে তাহার সঙ্গীদের সহায়তায় কবরটীর মাটি সমান করিয়া দিয়া তাহা পুনরায় সমাধির আকারে আনয়ন করে। ঘটনাটা খুবই গোপনে থাকিয়া গেল। কেহই জানিল না—প্রকৃত ব্যাপার কি?

ইয়াশিন আজ কাল ভালরূপ ঘুমাইতে পারে না—আহারে তাহার রুচি নাই—লোকের সঙ্গে মিশিবার ইচ্ছা নাই। সে ভালবাসে—কেবল নির্জ্জনতা; মনের শান্তি পায়—কেবল অনুতাপে। গুলনেয়ারের পাংশুমলিন মুখ সর্ব্বদাই তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাহাকে বড়ই যন্ত্রণা দেয়।

এইরূপ একটা মর্ম্মবেদনার জ্বালায় শ্রান্ত হইয়া, ইয়াশিন একখানি সোফার উপর মাথা রাখিয়া কি ভাবিতেছে—এমন সময়ে কাশেম তাহার পশ্চাৎ হইতে কঠোর স্বরে ডাকিল—"ইয়াশিন্!"

ইয়াশিন, সেই কক্ষ মধ্যে মৃত কাশেমের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভয়ে উঠিয়া দাড়াইয়া কম্পিতস্বরে বলিল—"কে তুমি?"

কাশেম বলিল—"আমায় চিনিতে পারিতেছ না তুমি ইয়াশিন? আমি কাশেম!"

"অ্যাঁ—কা—শে—ম! অসম্ভব! অসম্ভব! কাশেম মরিয়াছে! তুমি তার প্রেতমূর্ত্তি!" এই কথা বলিয়া অতি বিস্মিত ইয়াশিন দূরে সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল।

কাশেম তাহার কৃত্রিম শ্মশ্রু মোচন করিয়া বলিল—"দেখ দেখি—এই-বার চিনিতে পার কিনা ?"

ইয়াশিনের ভ্রম দূর হইল। সে সবিস্ময়ে দেখিল, সত্যই কাশেম তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া।

ঘোর শয়তান সে। তখনই সে বুঝিল, তাহার সমূহ সর্ব্বনাশ উপস্থিত। প্রকৃত কথা জানিতে পারিলে কাশেম তাহাকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। তখনই সে মনে একটা দৃঢ়তা আনিয়া, মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া, দৌড়িয়া আসিয়া কাশেমকে আবেগ ভরে আলিঙ্গন করিয়া, উল্লাসের স্বরে বলিল—"কাশেম! কাশেম! সত্যই তুমি! ইয়ে খোদা মেহের বান! এ কি দেখি ?"

কাশেম বলিল—"ইয়াশিন আমার গুল্ কোথায় ?"

ইয়াশিন তখনই—সপ্রতিভের মত উত্তর করিল—"তুমি তোমার দ্বারের চাবি বন্ধ দেখিয়া ভয় পাইয়াছ ? কোন ভয় নাই তোমার ভাই! গুল্ নিরাপদে আছে।"

কাশেম ব্যগ্রভাবে বলিল—"কোথায় সে ? তোমারই বাড়ীতে ?

ইয়াশিন। না—তাহাকে আশীরা দাই এর বাটীতে পাঠাইয়া দিয়াছি।

কাশেম। সে নিরাপদে আছে কি না, এই সংবাদটাই আমি আগে জানিতে চাই।

ইয়াশিন। সে সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। প্রতি সপ্তাহেই আমি তার কাছে লোক দিয়া টাকা পাঠাই ও তার সংবাদ পাই।

কাশেম। তাহাকে আশীরার বাড়ীতে পাঠাইবার কারণ কি ?

ইয়াশিন। সে কথা আশীরার মুখেই তুমি শুনিও।

কাশেম। আমি এখনই সেই গ্রামে যাইতে চাই!

ইয়াশিন। অসম্ভব! ভুলিয়া গেলে কি কাশেম—রাত্রি বারোটার সময়, বসোরা নগরের প্রবেশ দ্বার বন্ধ হইয়া যায়।

সত্যই তাই। কাশেম বলিল—"কাল প্রভাতেই আমি চলিয়া যাইব। আমার হাতে কিছু নাই। এক শত মুদ্রা আমায় দাও।"

ইয়াশিন। তোমার পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা আমার কাছে আছে। কাল সকালেই তোমায় দিয়া দিব।

কাশেম। সেই বেদুইন দস্যুকে তখন টাকা দাও নাই কেন?

ইয়াশিন। তার প্রথম কারণ, সে সেই রাত্রেই টাকা চায়। আমি তাকে প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলি। টাকা হবিবুল্লার গদিতে জমা রাখিয়াছিলাম, এজন্য সে রাত্রে দিতে পারি নাই!

ইয়াশিন কাশেমকে আহারাদির জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কাশেম বলিল—"আমি সরাইখানা হইতে খাইয়া আসিয়াছি। খাদ্যে আমার কোন প্রয়োজনই নাই। আমি শয়ন করিতে চাই।"

ইয়াশিন। আমার সঙ্গে উপরে চল।

কাশেম। না—এই ঘরে খুব হাওয়া আছে—এই খানেই থাকিব; তুমি উপরে গিয়া শোও।

ইয়াশিন তাই চায়। সে উপরে শয়ন করিতে গেল। কাশেম সেই কক্ষে ইয়াশিনের শয্যার উপর ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়াই কাশেম—ইয়াশিনের কক্ষের দিকে গেল। দেখিল কক্ষদ্বার বন্ধ। সে অনেক ডাকাডাকি করিল—কিন্তু ইয়াশিনের কোন সাড়া শব্দই নাই।

অনন্যোপায় হইয়া, কাশেম জানালার একটী গরাদে স্থানচ্যুত করিয়া সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সভয়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"ইয়াশিন! ইয়াশিন! কি সর্ব্বনাশ করিলে তুমি?"

ইয়াশিন দারুণ মর্ম্মযাতনায় আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার কক্ষের মেঝের উপর বিষপাত্র পড়িয়া আছে! তাহার দেহ—স্পন্দনহীন, শীতল। নাসিকায় শ্বাস নাই—বক্ষে স্পন্দন নাই। মুখশ্রী বিবর্ণ ও বিকটাকার। মুখের এ পরিবর্ত্তন, তীব্র বিষপান জনিত যন্ত্রণার ফল।

কাশেম সবিস্ময়ে দেখিল, ইয়াশিনের শয্যাপার্শ্বে একখানি পত্র পড়িয়া আছে। তাহার উপর কাশেমের নাম লেখা।

কাশেম সাগ্রহে সে পত্রখানি উঠাইয়া লইয়া এক নিশ্বাসে তাহা পড়িয়া ফেলিল। পত্রে লেখাছিল—

"ভাই কাশেম! আমি মহাপাপী। এজন্য আত্মহত্যা করিলাম। দারুণ অনুশোচনায়, মর্ম্মযাতনায়, মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় অবলম্বন করিতে যাইতেছি। এ সময়ে বেশী কথা লেখা অসম্ভব। আমার এ মহাপাপ কি, তাহা তুমি আশীরা দাইয়ের নিকট সব জানিতে পারিবে। সিন্ধুকের মধ্যে তোমার টাকা আছে। তাহা লইও।—"হতভাগ্য ইয়াশিন।"

পত্র অস্ফুট। তাহাতে প্রকৃত কথা অব্যক্ত। কাশেম তখনই সেই বাটী ত্যাগ করিয়া আশীরার আবাস গ্রামের পথ ধরিল।

আশীরা সকল কথাই জানিত। সে বসোরায় ফিরিয়া আসিয়া, বৃদ্ধ গোলামের মুখে সকল কথাই শুনিয়াছিল। ইয়াশিনের মুখদর্শনেও মহাপাপ, এই ভাবিয়া, সে বসোরা ত্যাগ করিয়া নিজ গ্রামে চলিয়া গেল।

যে সর্দ্দার প্রহরী গুল্‌নেয়ারকে কবর মধ্যে প্রোথিত করিয়াছিল, সে আশীরার ভগ্নি পুত্র। তাহার মুখ হইতে সে গুল্‌নেয়ারের পলায়নের সংবাদ অবগত হয়।

কাশেম, আশীরার মুখে সকল ঘটনাই অবগত হইল। ব্যাপারটা যেন তাহার চক্ষে উপন্যাসের ঘটনার মত বোধ হইল। আর গুল্‌নেয়ার যে মরে নাই, কবর হইতে কোন উপায়ে পলাইয়া সে আত্মরক্ষা করিয়াছে, এ সংবাদে সে খুবই আশান্বিত হইল।

কাশেম সেই দিনই বসোরায় ফিরিয়া আসিয়া শুনিল, ইয়াশিনের মৃত দেহের সমাধি হইয়া গিয়াছে। গোলামই লোকজন ডাকিয়া, চেষ্টা করিয়া এই ব্যাপারটা শেষ করিয়া ফেলিয়াছে।

কাশেম সামান্য অনুসন্ধানের পর, এক ক্ষুদ্র পেটিকার মধ্যে ইয়াশিনের সিন্দুকের চাবি পাইল। চাবি খুলিয়া দেখিল—তাহার মধ্যে একটী বৃহৎ তোড়ায় তাহার সেই পঞ্চাশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা রহিয়াছে। আর সেই মুদ্রার থলিয়ার গায়ে তাহার নাম লেখা।

কাশেম, সেই দিন রাত্রে, আশীরা দাইকে লইয়া বসোরার বহু দূরে দামস্কাসে আসিয়া নূতন নাম ধারণ করিয়া, ছদ্মবেশে বাস করিতে লাগিল। বাড়ীতে দাইকে রাখিয়া সে দরবেশের বেশ ধারণ করিয়া প্রতি নগরে, গ্রামে, পল্লীতে, গুলের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কি প্রকারে তাহার উদ্দেশ্য ও পরিশ্রম সাফল্য লাভ করে, তাহা পাঠক ইতি পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন।

* * * *

গুল্‌নেয়ারকে অসম্ভব উপায়ে নরাধম সরফরাজ খাঁর কবল হইতে উদ্ধার

করিয়া, সেই রাত্রেই, এক উষ্ট্রযানের সহায়তায়, কাশেম তাহার দামাস্কসের বাটীতে ফিরিয়া আসিল।

দীর্ঘকাল বিরহের পর আবার মিলন। মহা দুঃখের পর আবার মহা সুখ! বর্ষার পর আবার বসন্ত! দামাস্কসের নূতন বাটী আবার এই কান্তিময়ী গুল্‌নেয়ারের রূপজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আবার তাহাদের সুখের দিন ফিরিয়া আসিল।

এইখানেই আমরা আমাদের গল্প শেষ করিলাম।

সমাপ্ত।